তুষার

মাসুদ রানা

শকুনের ছায়া

দ্বিতীয় খন্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সবা প্রকাশনা

বেলাল

মাসুদ রানা

শকুনের ছায়া

[দ্বিতীয় খন্ড]

কাজী আনোয়ার হোসেন

সাংবাদিক যুগলকে নিয়ে বিকল্প পথে পালাচ্ছে থান্ডারবোল্ট মিশন। মরুভূমি, বন-বাদাড় ভেঙে। পাক-আফগান বর্ডারের বিশেষ এক জায়গায় পৌছতে হবে ওদের, বিকল্প পিক-আপ পয়েন্টে।

কিন্তু কর্নেল মুরাদ তা হতে দিবে না।

আদাজল খেয়ে লেগেছে সে, ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে।

রানাও নানান কৌশলে ফাকি দিয়ে চলেছে।

কিন্তু কতক্ষন ?

অবশেষে রেজিস্তানের মরুভূমিতে ওদের ঘেরাও করল মুরাদ। এখন?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০

বেলাল

EXCLUSIVE

BANGLAPDF

Please, Give us Some Credit When U Share Our Books

Visit Us At BANGLAPDF.NET

Scan By Tushar

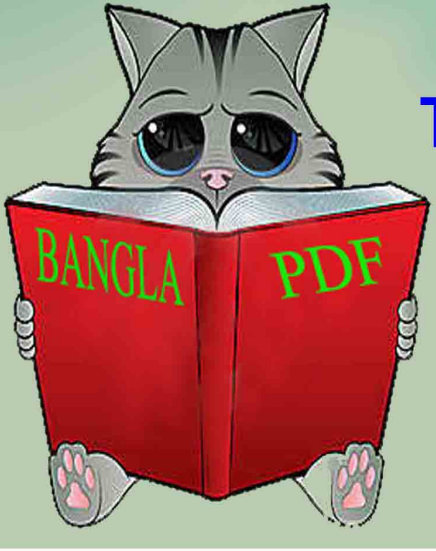

Editing

BELAL AHMED

ISBN 984 -16 - 7287- 1

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি, পি, ও, বক্স: ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

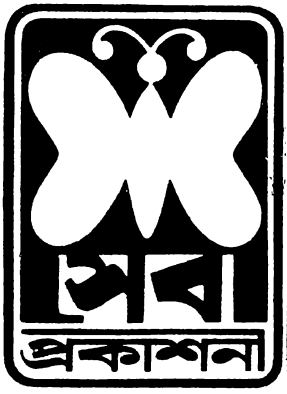

আটাশ টাকা

Masud Rana-287
SHOKUNER CHHAYA
[Part II]
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় *ভারতনাট্যম *স্বর্ণমৃগ *দুঃসাহসিক* মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ *রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত *এখনও ষড়যন্ত্র *প্রমাণ কই? বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ *বিদেশী গুপ্তচর *ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা*তিনশত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত *সতর্ক শয়তান *নীলছবি *প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক *এসপিওনাজ*লাল পাহাড় *হৃৎকম্পন *প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা। সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা *হাইজ্যাক * আই লাভ ইউ, ম্যান * সাগর কন্যা পালাবে কোথায় *টার্গেট নাইন * বিষ নিঃশ্বাস *প্রেতাত্মা *বন্দী গগল *জিম্মি তুষার যাত্রা *স্বর্ণ সংকট *সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য উদ্ধার *হামলা* প্রতিশোধ*মেজর রাহাত *লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর *নকল রানা *রিপোর্টার *মরুযাত্রা *বন্ধু *সংকেত*স্পর্ধা *চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী *কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন *বুমেরাং *কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ *কুচক্র *চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ *যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী *কালো টাকা কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯ *অশান্ত সাগর *শ্বাপদ সংকুল* দংশন*প্রলয় সঙ্কেত *ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ *ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা *অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ *শত্রুবিভীষণ*অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া *নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন *নীল দংশন *সাউদিয়া ১০৩ *কালপুরুষ *নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট *অমানিশা*সবাই চলে গেছে *অনন্ত যাত্রা *রক্তচোষা *কালো ফাইল মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল* বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ *মহাপ্রলয় *যুদ্ধবাজ* প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি *ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার *ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি দুর্গম গিরি *মরণযাত্রা *মাদকচক্র *শকুনের ছায়া।

এক

'সমস্যা, বস্,' বলে উঠল গ্যান্থার টুর পিছনে বসা খন্দকার জাহাঙ্গীর। ডন ও যূথী রয়েছে তার মুখোমুখি।

সামনের প্যাসেঞ্জার'স সীটে বসা মাসুদ রানা ঘুরে তাকাল, নজর চলে গেল পিছনের ফেলে আসা পথের ওপর। ধুলোর মেঘের মধ্যে দিয়ে হেডলাইট দুটোকে খুদে দুই জ্বলজ্বলে পুঁতির মত দেখাচ্ছে। সামনে নজর দিল ও। চোখ কুঁচকে উঠল। 'কতদূরে ওরা, জাহাঙ্গীর? দু'মাইল?'

'তিন মাইলের মত, বস্।'

রেডিওর দিকে হাত বাড়াতে যাচ্ছিল রানা, এমন সময় জ্যান্ত হয়ে উঠল ওর হেডসেট। 'ওয়ান টু টু,' করপোরাল সদরউদ্দিনের গলা ভেসে এল। 'কন্ট্যাক্ট অ্যাহেড, বস্। মনে হচ্ছে রোড ব্লক, বোধহয় পুলিস। মাইল দেড়েক সামনে।'

'টু, রজার। তোমাদের সামনে কোথাও গা ঢাকা দেয়ার জায়গা আছে?'

'আছে, বস্,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল। 'পুরনো এক পোড়ো বিল্ডিং আছে। রেশ বড়। ওভার।'

'ওকে, নেমে পড়ো রাস্তা ছেড়ে,' রানা নির্দেশ দিল। 'ওটার আড়ালে অপেক্ষা করো। এদিকে ফেউ লেগেছে আমাদের পিছনে।

আউট।' হেকমত আলির দিকে ঘুরল। 'আরও জোরে।'

পাঁচ মিনিট একটানা খিঁচে দৌড় লাগিয়ে বিল্ডিংটার দেখা পেল ওরা। মাটির তৈরি, আগাছায় ছাওয়া। পরিত্যক্ত হয়েছে অনেক আগে। দেখে মনে হয় কোনকালে হয়তো চায়ের দোকান ছিল। ওটার পিছনে শুকনো, পুকুরের মত অগভীর এক গর্তে ঘাপটি মেরে বসে আছে প্যান্থার ওয়ান। না থেমে হেকমতও নেমে পড়ল। সদরউদ্দিনকে দেখা গেল বিনকিউলারে চোখ রেখে একভাবে তাকিয়ে আছে সামনের রোডব্লকের দিকে।

রানাও দেখল। বেশ কয়েকটা পুলিসের গাড়ি। হেডলাইট নেভানো হলেও ছোট ছোট টর্চলাইট জ্বলতে দেখা যাচ্ছে কয়েকটা। এদিক-ওদিক ঘুরছে আলোর বীম। সামনের মিশমিশে কালো, ঢালু ল্যান্ডস্কেপের মাঝে ব্যাটাদের অবস্থান স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে।

'তাও ভাল ওরা আমাদের দেখার আগে আমরা ওদের দেখতে পেয়েছি,' মন্তব্য করল ও।

'কিন্তু আমরা পিছিয়ে পড়ছি, বস্,' কনুইয়ের কাছ থেকে হেকমত আলি বলে উঠল। 'ওরা যেভাবে পথে পড়ে যাওয়া সিকি-আধলির মত খুঁজছে আমাদের, তাতে মনে হয় কয়েক ঘণ্টা লাগবে এই জায়গা ক্রস করতে। এখনও পারাচিনারের অনেক কাছে রয়েছি আমরা। সকাল হয়ে গেলে...' থেমে গেল লোকটা। সেক্ষেত্রে কি ঘটবে তা সবাই বোঝে, তাই আর এগোল না।

'ডাইভার্শনের ব্যবস্থা করতে হয়,' নিজের মনে বলল চিন্তিত মাসুদ রানা। 'ম্যাপে দেখেছি কাছেই একটা গ্যাস পাইপলাইন আছে, একটু পিছনে ফেলে এসেছি ওটা।'

দাঁত বেরিয়ে পড়ল সদরউদ্দিনের। 'ঠিক, বস্। আমিও দেখেছি, মেইন গ্যাস লিঙ্ক। পুরোটাই প্রায় আন্ডারগ্রাউন্ড, তবে

এক মাইল আগের কালভার্টটা পেরিয়ে আসার সময় ওটাকে দেখেছি আমি। কালভার্টের নিচ দিয়ে গেছে, চার ফুট ডায়ামিটারের, একদম খোলা।'

'চমৎকার!'

সাংবাদিক কখন ওদের দলে ভিড়েছে কেউ খেয়াল করেনি। রানার উদ্দেশে বলল সে, 'মেজর, আপনি নিশ্চই মনে করেন না গ্যাস লাইনে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটলে ওরা আমাদের ধাওয়া করা ছেড়ে দেবে?'

মানসিক প্রস্তুতির সময় বাধা পড়ায় বিরক্ত হলো ও। তবু গলা যথাসম্ভব শান্ত রেখে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'মেইন গ্যাস পাইপলাইন ফাটলে কি হয় দেখেছেন কখনও?'

'না।'

'তাহলে চুপচাপ বসে থাকুন। দেখুন।'

সদরউদ্দিন ও আলালউদ্দিনকে কাজ সেরে আসার দায়িত্ব দিল রানা। এক পাউন্ড পিই-ফোর প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ আর ফিউজ নিয়ে রওনা হয়ে গেল দু'জনে। শেষ মুহূর্তে কি ভেবে কয়েক ফুট অতিরিক্ত ফিউজ নিতে বলেছিল রানা, যাতে বিস্ফোরণ খানিকটা দেরিতে ঘটে। দেখা গেল সেই দেরিটুকুর কারণেই প্রাণে বেঁচে গেল ওরা, নইলে ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে যেত। হাড়-মাংসের একটা কণাও খুঁজে পাওয়া যেত না কারও।

আধঘণ্টা পর কাজ সেরে ফিরতে দেখা গেল দুই কমান্ডোকে। আলাল সদরউদ্দিনের কাঁধ ধরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসছে। গর্তে পড়ে পা মচকে গেছে। এই জন্যে কম করেও পাঁচ মিনিট পিছনে পড়ে গেছে ওরা। এখনও বেশ দূরে আছে। মূল দল থেকে প্রায় দুইশো গজ দূরে আছে ওরা, এই সময় বিস্ফোরিত হলো লাইন। মনে হলো কোন থার্মো-নিউক্লিয়ার বোমা ফেটেছে বুঝি। কাছের

দুই শাট-অফ্ ভালভ স্টেশনের মাঝখানের ওই লাইনে এক মিলিয়ন কিউবিক ফুটেরও বেশি গ্যাস ছিল, আচমকা বিস্ফোরণের ধাক্কায় এবং তার ভয়ঙ্করত্ব দেখে আহাম্মক বনে গেল ওরা প্রত্যেকে।

কোনটা আগে ঘটেছে কেউই ঠিকমত মনে করতে পারল না পরে। গুড়-গুড় মেঘ ডাকার আওয়াজের সাথে মাটি কেঁপে উঠল থর-থর করে, বেসামাল হয়ে পড়ল দলের সবাই, পরমুহূর্তে মাটি ফুঁড়ে উদয় হলো বিশাল, ভয়াবহ এক আগুনের কুণ্ড। প্রথমে তীব্র নীলচে আলোয় ঝল্‌সে উঠল আশপাশের দশ-বিশ মাইল এলাকা, তারপরই গাঢ় কমলা লাল রঙ ধারণ করল ওটা, ব্যাঙের ছাতার আকার ধরে ওপরে উঠতে শুরু করল চারদিক আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে। মুহূর্তের জন্যে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে দৌড় লাগাল দুই কমান্ডো।

তখনই শুরু হলো পরের ধাক্কা। বিরতিহীন দুনিয়া কাঁপানো আওয়াজ আর ভূমিকম্পের সাথে বিধ্বস্ত পাইপ থেকে ফোয়ারার মত দমকে দমকে উঠতে শুরু করল লিকুইড গ্যাস, প্রতিটা দমক আগের কুণ্ডের লেজের আগুনের ছোঁয়ায় পিলে চমকানো হুপ্! হুপ্! শব্দে জ্বলে উঠতে থাকল। থামার নাম নেই, চলছে তো চলছেই। প্রতিটা হুপ্! আগেরটার চাইতে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে।

এরপর তৃতীয় এবং ফাইন্যাল ধাক্কা। হেভি আর্টিলারি ব্যারেজ চলার সময় যেমন গুরুগম্ভীর আওয়াজ করে, তেমনি আওয়াজের সাথে রাস্তার দু'পাশের দীর্ঘ পাইপ লাইন মাটির বুক ছিঁড়েখুঁড়ে ছিট্‌কে শূন্যে উঠে পড়ল বিশাল একেকটা মাটির চাঁই আর পাথর সহ। দৈত্যাকার অজগর সাপের মত এঁকেবেঁকে, পাক্ খেতে খেতে রকেটের বেগে অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের পলকে। দু'পাশের

অনেকখানি রাস্তাও গেল তার সঙ্গে।

বিস্ফারিত চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। আগুন ত্রিসীমানার পুরো অক্সিজেন শুষে নেয়ার ফলে ঠিকমত দম নিতে পারছে না কেউ, রীতিমত হাঁপানি রোগীর মত অবস্থা। কানের পর্দার ব্যথায় অস্থির।

পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হতে গাড়ির দিকে এগোল মাসুদ রানা। শান্ত গলায় বলল, 'চলে এসো, সময় হয়েছে।'

ডন নড়ছে না দেখে দু'পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল হেকমত আলি। লোকটা কি পরিমাণ আহাম্মক হয়েছে আন্দাজ করতে গিয়ে হেসে উঠল নীরবে। 'আসেন, সাংঘাতিক ভাই। যেতে হবে।'

বাঘলান।

আধ ঘণ্টা পর টেলিফোনে খবরটা পেল কর্নেল নাজাফ মুরাদ। কিন্তু তেমন ব্যস্ততা দেখাল না, বরং ধীরেসুস্থে কেন্ট ধরিয়ে টানতে লাগল। নজর সিলিঙে নিবদ্ধ। বিস্বাদ লাগছে ধোঁয়া, তবু টেনে চলেছে। লোকাল পুলিস অফিসারের জানানো লোকেশন এবং তার আশপাশের এলাকা নিয়ে ভাবছে। ঘুমের অভাবে চোখ লাল।

একটু আগে পর্যন্ত জালালের সেলে ছিল সে, বিস্ফোরণের খবর পেয়ে বেরিয়ে এসেছে। যা চাইছিল, জানা হয়ে গেছে। ওকে আর প্রয়োজন নেই তার। বাকি কাজ বরকতী করবে।

তার এইড সঙ্গে আনা ম্যাপ টেবিলে বিছিয়ে জায়গাটা পিন পয়েন্ট করে ফেলেছে ততক্ষণে। উত্তেজনায় কাঁপছে সে। 'এই যে,' ম্যাপের গায়ে কয়েকটা টোকা দিয়ে বলল। 'এখানে আছে শয়তানের বাচ্চারা! স্যার, চলুন, দেরি হয়ে যাচ্ছে!'

নজর নামিয়ে তাকে দেখল কর্নেল। 'গিয়ে কি হবে?'

বিস্মিত হলো এইড। 'ওদের ধরতে হবে না?'

'নিশ্চই ধরতে হবে, তবে এখনই নয়।'

তার শান্ত গলা শুনে আরও তাজ্জব হলো যুবক। 'স্যার...?'

'এই মুহূর্তে আমি খুব ক্লান্ত, মাই ডিয়ার। এরকম অবস্থায় কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দেয়া উচিত নয়, বুঝলে? তাতে ভুলভাল হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে। তাই এখনই কিছু করতে চাই না,' কষে এক টান দিল সে সিগারেটে। 'আমাদের রহস্যময় অনুপ্রবেশকারী বন্ধুরা এর মধ্যে দু'বার ফাঁকি দিয়েছে, অতএব আর ফাঁকিতে পড়তে রাজি নই আমি। আগে বিশ্রাম নেব, তারপর...'

'কিন্তু, স্যার, ওখানে এতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল...'

'তাতে বরং লাভ হয়েছে আমাদের,' হাসল মুরাদ। সিগারেট মেঝেতে ফেলে জুতোর গোড়ালি দিয়ে পিষে দিল।

'জ্বি!' বোকা বোকা চেহারা হলো এইডের।

'দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ওরা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে ওরা দক্ষিণে যাচ্ছে। প্রমাণ করে দিয়েছে যে এত অত্যাচারের পরও জালাল ছেলেটা ফের মিথ্যে তথ্য দিয়েছে আমাদের। ওদের গন্তব্য সম্পর্কে ছেলেটা কি বলেছে, মনে আছে তোমার?'

'জ্বি, স্যার। বলেছে পুবে যাবে ওরা। পেশোয়ারের দিকে।'

মাথা ঝাঁকাল কর্নেল। 'পাইপলাইন দুর্ঘটনার লোকেশন জেনে তোমার কি মনে হয়, সেদিকেই যাচ্ছে ওরা?'

চোখ কুঁচকে কয়েক সেকেন্ড ভাবল সে। 'না, স্যার।'

'এই তো বুঝেছ। ওরা এখন লেজ দাবিয়ে দক্ষিণে ভাগছে, জেনে রাখো। কয়েক ঘণ্টা আগে ওদের এ দেশ ছেড়ে ভেগে যাওয়ার চান্স ছিল ষোলো আনা, এখন নেই এক আনাও। ঠেকিয়ে দিয়েছি আমরা। ওরা এতক্ষণ কোথায় ছিল একটু আগে পর্যন্তও

জানতাম না, এখন জানি। কোথায় যাচ্ছে তাও। কাজেই শুধু শুধু ব্যস্ত হয়ে লাভ কি? ধৈর্য ধরো, ওরা ফাঁদে পড়তে যাচ্ছে।'

আরেকটা সিগারেট ধরাল কর্নেল। ঠোঁট গোল করে ধোঁয়া ছাড়ল ম্যাপের ওপর, হালকা নীল রঙের একটা রিঙ ঘুরতে ঘুরতে এইড ওটার যেখানে পিন পয়েন্ট করেছিল, সেখানে গিয়ে পড়ল।

'রাত আর বেশি বাকি নেই, বেশিদূর যেতে পারছে না ওরা। আলো ফোটার আগেই কোথাও না কোথাও আশ্রয় নিতে হবে। ওদের জায়গায় হলে কি করতে তুমি, কোথায় গা ঢাকা দিতে?'

'বনের মধ্যে, কর্নেল। ছায়া আছে ওখানে, নদীর পানি আছে।'

হাসি ফুটল মুরাদের মুখে। 'ঠিক বলেছ। গ্যাস লাইন নিয়ে এনার্জি মিনিস্ট্রি মাথা ঘামাক, আমি এদিকে একটু বিশ্রাম করি। তবে আগে রোডব্লকের ব্যবস্থা করতে হবে।'

টেলিফোনটা কাছে টেনে আনল সে। এক ঘণ্টার মধ্যে কয়েকটা কপ্টার পৌঁছল দুর্ঘটনাস্থলে, অনেকটা জায়গা নিয়ে ঘেরাও করে ফেলল দক্ষিণে যাওয়ার পথ। তালেবান গার্ড, রেগুলার আর্মি আর পুলিস মিলে কয়েকটা ব্লক খাড়া করল। পথের যেসব জায়গায় উঁচু এমব্যাঙ্কমেন্ট আছে, সেসব জায়গা বাছাই করে বসানো হলো ওগুলো। প্রতিটা এমব্যাঙ্কমেন্টের চূড়োয় থাকল দুটো করে মেশিনগান পোস্ট, সাপোর্টিং টীম। রাস্তা বন্ধ করা হলো কাঁটাতারের ব্লক আর বড় বড় তেলের ড্রাম দিয়ে।

ভোর হওয়ার খানিক আগে সেখানে পৌঁছল মুরাদ। বিস্ফোরণের পঁচিশ মাইল দক্ষিণে জায়গাটা। তার অনুপস্থিতিতে যে আর্মি লেফটেন্যান্ট যৌথ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল, তার সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি জেনে নিল। অল্প সময়ের জন্যে হলেও বিশ্রাম পেয়ে বেশ তরতাজা অনুভব করছে এখন কর্নেল। ঝরঝরে লাগছে।

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল সে, এই সময় ব্যাপারটা চোখে পড়ল। উত্তরদিকে, কাছের ছোট এক পাহাড়ে একজোড়া হেডলাইট জ্বলে উঠেই নিভে গেল। এদিকে আসার হাইওয়ের ওপর।

শুধু মুরাদ নয়, প্রায় সবারই চোখে পড়ল ব্যাপারটা। চারদিক থেকে নানান বিস্ময়ধ্বনি উঠল। ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে থাকল কর্নেল।

'নিশ্চই ওরা, কর্নেল!' রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল লেফটেন্যান্ট।

'কিন্তু ওরা তো ইনফ্রা-রেড হেডলাইটে চলছিল, হঠাৎ আলো জ্বালার কি এমন দরকার পড়ল?'

'মনে হয় আমাদের ভাল করে দেখার জন্যে, স্যার।'

'দুটো গাড়ি আর কিছু লোক নাও সঙ্গে, কুইক!' বলল কর্নেল। 'আমার সঙ্গে এসো। আর দয়া করে সবাইকে সতর্ক থাকতে বোলো। ওরা যা-তা নয়, তাছাড়া ওটা কোন ফাঁদও হতে পারে।'

'রাইট, স্যার।'

দু'মিনিটের মধ্যে গর্জন করে স্টার্ট নিল দুটো ল্যান্ড রোভার, মুরাদ উঠল প্রথমটায়। রহস্যময় হেডলাইট দুটো যেখানে দেখা গেছে, ঠিক দশ মিনিটের মাথায় সেখানে পৌঁছে গেল দলটা। গাড়ি একটু দূরে রেখে পায়ে হেঁটে এগোল কর্নেল।

কিছু নেই।

কেউ একজন টর্চলাইটের ফোকাস ফেলল টারমাকের হাইওয়েতে, মুরাদ হাঁটু গেড়ে বসে তীক্ষ্ণচোখে জায়গাটা পরখ করল। কয়েক সেট হেভি ডিউটি স্যান্ড টায়ারের ছাপ চিনতে পেরে সিধে হলো, এদিক-ওদিক তাকাল। 'এখান থেকে রাস্তা ছেড়ে সরে গেছে ওরা। দশ মিনিটও হয়নি।'

লেফটেন্যান্টের চেহারায় সন্তুষ্টি ফুটল। 'দুটো গাড়ি, স্যার।

বেশি দূর যেতে পারেনি এখনও।'

'লোকজন আর লং রানের উপযুক্ত যত গাড়ি আছে, সব রেডি করো তাড়াতাড়ি। সুইপ সার্চ শুরু করতে চাই আমি।'

'ইয়েস, কর্নেল!' খুশি হলো যুবক।

রানা সম্পর্কে যদি লেফটেন্যান্টের বিন্দুমাত্র ধারণাও থাকত, খুশি হওয়ার বদলে উদ্বিগ্ন হত। শত্রুকে ধাঁধায় ফেলার একেবারে লেটেস্ট টেকনিক খাটিয়ে গেছে রানা রোডব্লক দেখতে পেয়ে। এই পর্যন্ত এসে পিছিয়ে গেছে একই ছাপের ওপর দিয়ে। কাজটা কঠিন, সময়সাপেক্ষ, তবে অসম্ভব নয়। ও যা চেয়েছিল তাই হয়েছে, বিভ্রান্তিতে পড়ে প্রথমেই যে ভাবনা অনুসরণকারীর মাথায় আসা উচিত, তাই ভেবে বসে আছে মুরাদ।

খানিকটা পিছিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে ভাগার সময় পলকের জন্যে এক সেট হ্যান্ড স্পটলাইট জ্বেলেছিল সদরউদ্দিন, হেডলাইট নয়। আফগানরা যখন উত্তর-পশ্চিমের বিশাল জায়গাজুড়ে ওদের গরু খোঁজা করছে, থান্ডারবোল্ট টীমের দুই পিঙ্ক প্যান্থার তখন পুবদিক থেকে রোডব্লক বাই-পাস করে সরে পড়েছে। ভোর ছটায় সূর্য উঠল, তার আগেই কান্দুজ রিভার ভ্যালির এক নির্জন আপার স্লোপে সারাদিনের জন্য আশ্রয় নিল ওরা। রাতের হিম পাহাড়ী বাতাস ততক্ষণে সূর্যের তাপে গরম হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

মাথার ওপরের ডালপালার ফাঁক দিয়ে সার্চলাইটের মত সোনালী আলো আসছে নিচে। গাড়ি থেকে নেমে পড়ল মাসুদ রানা, গাছের ছাউনি প্রয়োজনের তুলনায় কিছুটা পাতলা মনে হতে ক্যামোফ্লেজ নেটিঙের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিল। শুরু হয়ে গেল কাজ। দুটো গাড়ি একটু দূরে দূরে রেখে প্রথমে আলোর প্রতিফলন ঠেকাতে হেসিয়ান দিয়ে সব কাঁচ ঢেকে ফেলা হলো। মাটিতে ছোট-বড় সাইজের ডাল পুঁতে তার ওপর বিছানো হলো

নেট, এর ফলে গাড়ির শেপ আর চেনার উপায় রইল না বাইরে থেকে। নেটের ওপর বিছিয়ে দেয়া হলো গাছের পাতার মত রাবারের ফয়লেজ। পাতাসহ কিছু গাছের ডালও।

কোন অনুসন্ধানী পাইলট যদি আকাশ থেকে এরকম জায়গায় লুকানো গাড়ি শনাক্ত করতে চায়, তাহলে এক মাইলের মধ্যে পৌঁছার আগেই তাকে সফল হতে হবে। নইলে কাছে এসে পড়লে প্লেনের গতির কারণে ঝাপসা, অস্পষ্ট হয়ে যায় সব, নির্দিষ্ট কিছু দেখা একেবারেই অসম্ভব হয়ে ওঠে। অবশ্য এ থিওরি সাধারণ ক্ষেত্রে খাটে, থান্ডারবোল্টের বেলায় নয়। পিঙ্ক প্যান্থারের ক্ষেত্রে সে সব যাতে কাজে না আসে, সে আয়োজন নিশ্ছিদ্র করে তবেই এসেছে রানা।

কাজ শেষ হতে সব চেক করল ও, তারপর সন্তুষ্ট হলো। একেবারে কাছে গিয়ে না দাঁড়ালে এমনকি গ্রাউন্ড লেভেল থেকেও ওগুলোকে গাড়ি বলে চেনার উপায় নেই এখন। কোন প্লেন যদি সে চেষ্টা করে গ্রাউন্ড সার্চ রাডারের সাহায্যে, নেটিঙের সাথে জুড়ে দেয়া রাবারের ফয়েলেজ তার সঙ্কেত হজম করে ফেলবে, কিছুই টের পাবে না ওটা। আফগানরা যদি গাড়ির হিট-স্পট শনাক্ত করার জন্যে ইনফ্রা-রেড সিস্টেমও ব্যবহার করে, তবু কাজ হবে না।

পিঙ্ক প্যান্থারের বিশেষ পেইন্ট পিগমেন্ট সত্যিকারের গাছের পাতার মত ক্লোরোফিল ছড়ায়, দুটোর মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পাবে না ইনফ্রা-রেড।

এবার অন্য কাজে মন দিল রানা। ডন ও যূথী যাতে এটাকে কোন রোমাঞ্চকর অভিযান ভেবে বসে না থাকে, সে জন্যে ফয়েজের জিম্মায় ছেড়ে দিল ওদের, ঢালের আরও উঁচুতে সুবিধেজনক জায়গা দেখে সোলার স্টিল তৈরি করতে পাঠিয়ে দিল। পর্যাপ্ত খাবার পানি নেই, কাজেই এছাড়া উপায়ও নেই।

সদরউদ্দিন ও হেকমত আলিকে পাঠাল উত্তর আর পশ্চিম দিগন্তে কড়া নজর রাখতে। সামান্য ধুলো দেখলেও খবর দেবে ওরা। একই সময় আলালউদ্দিন ওরফে টাইগার এ-থার্টিন স্কাইওয়েভ ট্রান্সমিটারের ফোল্ড করা চল্লিশ ফুট দীর্ঘ হরাইজন্টাল এরিয়াল নিয়ে গাছে উঠে পড়ল। সেট করতে লেগে গেল। থান্ডারবোল্টের বার্তা ঢাকায় পৌঁছতে সাহায্য করবে জিনিসটা।

ওদিকে ফয়েজের দেয়া এক হাত লম্বা শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়তে গিয়ে বেকুব হয়ে গেল ডন। ভীষণ শক্ত মাটি, একেবারে পাথরের মত। গাঁথার চেষ্টা করলে ঠং করে শব্দ হয়, বাউন্স করে শাবল। অনেক কষ্টে, প্রচুর ঘাম ঝরিয়ে ছয়টা ছোট ছোট গর্ত খুঁড়ল সে, তারপর করপোরালের ভাষণ শুনতে বসল। সে-ও ছয়টা খুঁড়েছে। বিশেষ কায়দায়, কাছাকাছি খোঁড়া হয়েছে ওগুলো ছয়টার একেক গ্রুপ করে।

গর্তের তলার মাটি থেকে আর্দ্রতা তুলে আনার জন্যেই এই বিশেষ কায়দা, ব্যাখ্যা করল সে। দিন শেষে নাকি প্রতি গর্ত থেকে এক লিটার করে মোট বারো লিটার বিশুদ্ধ খাবার পানি পাওয়া যাবে।

'কি করে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল যূথী।

'দাঁড়ান, দেখাচ্ছি।' প্রতিটা গর্তে একটা করে ক্যান বসাল ফয়েজ, আধ লিটারের বেশি ওগুলোর ধারণ ক্ষমতা। ক্যান আর গর্তের দেয়ালের মধ্যিখানে গাছের পাতা ভরে ফাঁক বুজিয়ে দিল সে। এরপর খাকি রঙের বারোটা প্লাস্টিক শীট দিয়ে সবগুলো গর্তের মুখ সামান্য ঢিলা করে ঢেকে চারদিকে পেরেক মেরে মাটির সাথে আটকে দিল। সবশেষে প্রতিটা শীটের মাঝখানে একটা করে পোয়াটেক ওজনের পাথর চাপিয়ে দিল, ফলে ঢালু হয়ে থাকল ওগুলোর কেন্দ্র।

'এবার,' মাস্টারী ঢঙে শুরু করল সে। 'সূর্যের তাপে এই শীটগুলো উত্তপ্ত হয়ে গর্তের ভেতরটা গরম করে তুলবে, ফলে ভেতরের মাটিতে আর্দ্রতার সৃষ্টি হবে। বাষ্পের মত ওপরে উঠে আসবে তা, এই শীটের ভেতরদিকে বাধা পেয়ে তরল হতে শুরু করবে। বিন্দু থেকে একটু একটু করে ফোঁটার মত বড় হয়ে ঢাল গড়িয়ে পাথর বরাবর নিচে এসে থামবে, তারপর এক সময় আরও বড় হবে, ভার সইতে না পেরে পেতে রাখা ক্যানের মধ্যে পড়তে থাকবে। ব্যস্, হয়ে গেল পানি।' হাসল করপোরাল।

যূথীও হাসল। 'দারুণ আইডিয়া তো!'

ন'টার দিকে নাস্তা খেল ওরা। সবই শুকনো খাবার, কফি ছাড়া। গর্ত খুঁড়ে খটখটে শুকনো ডাল দিয়ে আগুন জ্বালল জাহাঙ্গীর। কফি তৈরি হতে বাকি জ্বালানি তুলে গর্তের পাশে রেখে দিল, নেভাল না। একসময় আপনিই নিভে গেল ওগুলো, সামান্যতম ধোঁয়াও উঠল না।

নাস্তার চেয়ে কফিতেই বেশি আগ্রহ দেখাল সবাই। দুই ওয়াচের নাস্তা করার সময় অন্য দু'জন ডিউটি করল তাদের বিকল্প হিসেবে। তারপর স্লিপিং ব্যাগ বিছিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিশ্রাম নিল কেউ কেউ, নয়তো গল্প করে সময় কাটাল। নার্স জাহাঙ্গীরের পরিচর্যায় এরমধ্যে কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছে জাফর আহমেদ, সে-ও থাকল সবার সাথে। দলের প্রত্যেকের চেহারায় দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের ছাপ দেখে গর্ব হলো মাসুদ রানার।

ঠিক বারোটায় প্যান্থার ওয়ানে উঠে বসল ও আর টাইগার। এখনও একটু একটু খোঁড়াচ্ছে সে। গতরাতে পাইপ লাইন ওড়াবার কাজে ফিউজ যদি আরেকটু কম ব্যবহার করা হত, তাহলে কি ঘটত, এখনও থেকে থেকে সেই কথা ভাবছে

লোকটা। এমনভাবে পা মচকে গেল, সময় থাকতে ডেঞ্জার জোন ছেড়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে আসা কোনমতেই সম্ভব ছিল না ওদের, এবং রানার নির্দেশে বাড়তি ফিউজ না ব্যবহার করলে বোমাও অনেক আগেই ফাটত। ফল হত...

আরেকবার অজান্তে শিউরে উঠল আলালউদ্দিন, আড়চোখে পাশে বসা ধ্যানমগ্ন মাসুদ রানাকে দেখে নিয়ে হাত বাড়াল স্কাইওয়েভ ট্রান্সমিটারের দিকে। ঠিক ১২০৪ মিনিটের সময় থান্ডারবোল্ট মিশনের প্রথম হাই স্পীড মোর্স মেসেজ ভেসে পড়ল ইথারে, তারপর 'রিসিভ' সুইচ টিপে অপেক্ষার পালা।

দু'পাশের জানালায় ভিড় করা দলের অন্যদের দিকে তাকাল টাইগার, মুখে নার্ভাস হাসি। এর কারণ আছে। এরকম পরিবেশে এরিয়েল ইরেক্ট করা খুবই জটিল এক কাজ, তারওপর কাজটা ঠিক হয়েছে কি না বোঝার কোন তাৎক্ষণিক উপায় নেই। আবার হয়ে থাকলে ঢাকার সাথে সাথে কাবুলের কমিউনিকেশনস্ হেডকোয়ার্টার্সও মেসেজ পিক্ করেছে কি না, তাও বোঝার উপায় নেই।

হিন্দুকুশের মত মাউন্টেন রেঞ্জের কোন পাহাড়চূড়োর বনের মধ্যে থেকে মেসেজ পাঠানো যেমন কঠিন, তার জবাব রিসিভ করাও তেমনি। অথচ বসে থাকার উপায় নেই, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঢাকা অ্যাকনলেজ না করলে আবার ট্রান্সমিট করতে হবে। প্রয়োজনে আবার। দলের অবস্থান ফাঁস হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে এতে। কিন্তু কিছু করার নেই।

আরেকবার রানাকে দেখল টাইগার। পেটের ওপর দু'হাত বেঁধে আয়েশী ভঙ্গিতে হেলান দিয়ে বসে আছে ও, মাথা সীটের হেডরেস্টে। আফগান টুপিতে চোখ ঢাকা। ঠোঁটের কোণে সিগারেট পুড়ছে, নীলচে ধোঁয়া পাক্ খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে জানালা

দিয়ে। ওদিকে হেকমত আলি পরের শিফটের দায়িত্ব খন্দকার জাহাঙ্গীরের ওপর ছেড়ে ফিরে এসেছে, প্যান্ট্রার টুর নিচে স্লিপিং ব্যাগ বিছিয়ে একটু ঘুমিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে।

কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না। থেকে থেকে স্ত্রীর মুখটা ভেসে উঠছে মনের পর্দায়। ডাক্তারের হিসেবে গতকাল ছিল তার মা হওয়ার তারিখ। তাই ওদিকের খবর জানার জন্যে মনটা ছটফট করছে। একবার ভেবেছিল ট্রান্সমিশনের আগে টীম লীডারকে অনুরোধ করে খবরটা ঢাকাকে জানাতে। সাহস হয়নি। এরকম মুহূর্তে কোন ব্যক্তিগত বিষয় যোগ করে মেসেজ ভারী করার কথা চিন্তা করাও অন্যায়, তবু মন মানে না। পাশ ফিরে শুলো হেকমত আলি, এক হাত চোখের ওপর আড়াআড়ি রেখে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করল।

তখনই শোনা গেল টাইগারের উল্লসিত চিৎকার। 'ইউরেকা, বস্! ঢাকা অ্যাকনলেজ করেছে। কাল বারোটায় আমাদের অনুরোধের জবাব দেবে ওরা।'

বাঘলান।

বসে আছে জালাল আহমেদ। হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে দেয়ালে হেলান দিয়ে আছে। পরনে জাঙিয়া ছাড়া কিছু নেই। তবে আজ একটু ভাল লাগছে তার, সুস্থ লাগছে। গায়ের বিষব্যথায় গতকাল নড়তেই পারেনি ও।

বারো ঘণ্টার বেশি হয়ে গেছে বরকতী বা কর্নেল মুরাদের দেখা নেই। কাল রাতের পর আর আসেনি তারা। আসবেও না আর। জালাল নাকি অনেক উপকার করেছে তথ্য দিয়ে, বলে গেছে মুরাদ। অনেক উপকার করেছে ওদের। কাজেই তার ওপর আর নির্যাতন করা হবে না।

কিন্তু জালাল তা বিশ্বাস করে না। ও জানে, মুরাদ না হোক, বরকতী হারামজাদা আসবেই, জালালের লাশ না দেখা পর্যন্ত শান্তি হবে না শয়তানটার। থমকে গেল সে, কি এমন উপকার হয়েছে ব্যাটাদের? কী এমন তথ্য জানিয়েছে সে? কি যেন? হ্যাঁ, মনে পড়েছে–বিকল্প এস্কেপ প্ল্যান সম্পর্কে জানতে চাইছিল ওরা। কিন্তু··· জালাল নিজেই তো কিছু জানে না সে ব্যাপারে, তাহলে কী এমন তথ্য দিল যাতে উপকার হয়েছে আফগানদের?

চোখ বুজে ভাবতে চেষ্টা করল ও। থান্ডারবোল্টের বিকল্প এস্কেপ প্ল্যান আছে, এইটুকুই কেবল জানা ছিল তার, কিন্তু সেটা যে কি, তার কিছুই জানত না। জানার কথাও নয়, কারণ সে ওই টীমের সদস্য নয়। জানত না প্রথমটার কথাও। হামিদার চাচার ওখানে মাসুদ রানা ও শহীদের আলোচনার সময় একবার 'পারাচিনার' শব্দটা শোনে সে, তাতে আন্দাজ করে নেয় ওখান থেকেই প্লেনে করে পালাবে ওরা। এক পরিত্যক্ত এয়ারস্ট্রিপ ছাড়া কিছুই যেখানে নেই, অনর্থক সেখানকার নাম কেন উচ্চারিত হবে? এই ধারণার ওপর নির্ভর করে সম্ভাবনাটার কথা অনুমান করে নিয়েছিল জালাল আহমেদ।

স্রেফ অনুমান ছিল ব্যাপারটা। তবু, হাজারো নির্যাতনের মুখেও ও নাম মুখে আনেনি সে, পরিষ্কার মনে আছে। কর্নেলকে সে প্রথমে বোঝাতে চেষ্টা করেছে রেইডার পার্টির সাথে ওর কোন সম্পর্ক নেই। কানেই তোলেনি মানুষটা, নির্যাতন করে কবুল করিয়ে ছাড়ল, আছে। একইভাবে রেইডারদের ফিরিয়ে নিতে যে এয়ারক্র্যাফট আসবে, তাও কবুল করিয়ে নিল।

অস্বীকার করে সেবারও লাভ হয়নি, কারণ এরমধ্যে তার জানা হয়ে গেছে যে অমুক দিন ইরানীরা এক অজ্ঞাত ক্র্যাফটের অবস্থান শনাক্ত করেছিল ইরান-আফগান বর্ডারে। কর্নেলের দৃঢ়

বিশ্বাস, ওটায় করেই এসেছে রেইডার পার্টি। শেষ পর্যন্ত পথ নেই দেখে তাকে ভুল পথে চালাতে চেয়েছিল জালাল, কাজ হয়নি। ধূর্ত মুরাদ গারদেজের সাথে পারাচিনারেও ফাঁদ পাতে ওদের ধরার জন্যে।

সুযোগ ফস্‌কে যেতে ফের ওর ওপর শুরু হয় নির্যাতন। এবার দু'জনে একসঙ্গে লাগে জালালের পিছনে। গত ছত্রিশ ঘণ্টায় বহুবার নরক দর্শন করেছে সে, তবু মুখ খোলেনি। খুলবে কি, জানলে তো! বিকল্প প্ল্যান সম্পর্কে তো কিছুই জানে না ও। হামিদাকে নিয়ে অমুকখানে অতটার মধ্যে পৌঁছতে হবে, গাড়ি থাকবে, তাতে চড়ে বসতে হবে, ব্যস্, এই পর্যন্তই ছিল ওর জানার দৌড়। তাই বলেছে।

অথচ কাল রাতে শেষবারের মত যখন ওর সেল থেকে কি এক জরুরী খবর পেয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল কর্নেল, বলে গেল ওর দেয়া তথ্যে নাকি অনেক উপকার হয়েছে তার। কাজেই আর নির্যাতন করবে না সে জালালের ওপর। কথাটা কেন বলল কর্নেল, কিছুতেই তার মাথায় আসছে না।

এ নিয়ে অনেক ভেবে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছল সে। তা হলো, কর্নেল ওকে নির্যাতন করবে না, কারণ ওকে আর দরকার নেই তার। কিন্তু বরকতীর? তার কাছে নিশ্চয়ই জালালের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি? তার মানে এবার এলে আসবে বরকতী, যা করার সে-ই করবে? ঝিম্ মেরে অনেকক্ষণ বসে থাকল জালাল। ঠিক তাই, বাকি কাজ বিচারমন্ত্রী করবে। সেটা কি? ফায়ারিং স্কোয়াড?

শিউরে উঠল যুবক। হামিদা···হামিদা কোথায় আছে? এদের ধরাছোঁয়ার বাইরে আছে তো? বেঁচে আছে তো? ভিলাটা এত চুপচাপ কেন? তালেবান হারামজাদারা কোথায় সব, নেই নাকি? কাল অত ব্যস্ত হয়ে কোথায় গেল মুরাদ? কি খবর এসেছিল?

থান্ডারবোল্ট টীম ধরা পড়েছে? নাকি ওরা কোথায় আছে জানা গেছে?

মন বলল, না। মাসুদ রানাকে ধরা এইসব কাঠমোল্লার কম্ম নয়। জীবনভর ছুটে বেড়ালেও পারবে না ওরা। অবশ্য কর্নেল মুরাদ...জালালের ভাবনা হোঁচট খেল। এই মানুষটা অন্যরকম। যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, তেমনি ধূর্ত ব্যাটা। এ যদি উঠেপড়ে লাগে...

ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়াল সে। অবাক হয়ে গেল তেমন ব্যথা লাগল না বলে। পুরো এক রাত বিশ্রাম পেয়ে সেরে গেছে গায়ের ব্যথা। হাত-পা ছুঁড়ল সে, একদম ঠিক আছে। কোন অসুবিধে নেই।

তখনই অসম্ভব চিন্তাটা ঢুকল মাথায়–পালাতে হবে! পালাতে হবে এখান থেকে। এই একটা সুযোগ, বোঝা যাচ্ছে ভিলায় লোকজন তেমন নেই। এই সময় যদি...কিন্তু কি করে? উদভ্রান্তের মত এদিক-ওদিক তাকাল সে–একটা অস্ত্র চাই, যে কোন একটা অস্ত্র।

কিন্তু সেল তো খালি, খড়ের এক ম্যাট্রেস ছাড়া কিছুই নেই। না, আছে! একটা চেয়ার আছে। কাল রাতে কর্নেল সেলে আসার পর ওটা এনে বসতে দেয়া হয়েছিল তাকে, আর ফিরিয়ে নেয়া হয়নি। বোধহয় ভুলে গেছে গার্ড। কিন্তু চেয়ার দিয়ে কি...

ভাবনা থামিয়ে চট্ করে বন্ধ দরজার দিকে তাকাল সে। স্টীল প্লেট দিয়ে দরজা মুড়ে রাখার ফলে বাইরের কিছু দেখা যায় না। অবশ্য কাছে গিয়ে চাবির ফুটো দিয়ে তাকালে এক-আধটু দেখা যায়। গার্ড কি আছে ওপাশে? ফুটোয় চোখ রেখে ওর কার্যকলাপ দেখছে? পায়চারি করার ভঙ্গিতে সেদিকে এগোল জালাল, চট্ করে উঁকি দিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল–নেই।

চেয়ারটা দরজার পাশের দেয়ালের কাছে টেনে নিয়ে এল সে এবার, এখন ফুটো দিয়ে তাকালেও কেউ ওকে দেখতে পাবে না। মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে ওটার পায়াগুলো পরখ করতে বসল। পিছনের একটা দুর্বল মনে হলো জালালের, তক্ষুণি ওটা নিয়ে পড়ল।

দশ মিনিট নিরলস চেষ্টা চালিয়ে আরও দুর্বল করে ফেলল সে পায়াটাকে, তারপর কয়েক হ্যাঁচকা টানে ভেঙে ফেলল। আরেকবার বাইরে উঁকি দিয়ে দেখে নিল—না, কেউ টের পায়নি ব্যাপারটা। চেয়ার দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখল জালাল। কেউ যাতে ঢুকেই ব্যাপার টের পেয়ে না যায়। এক হাত লম্বা, চৌকো, ভারী পায়াটা গুঁজে রাখল দেয়াল আর ম্যাট্রেসের ফাঁকে।

এইবার! দাঁতে দাঁত পিষল জালাল আহমেদ। গার্ড হারামজাদাকে ভেতরে আনার ব্যবস্থা করতে হবে, তারপর সুযোগ বের করে পায়ার এক বাড়িতে শুয়োরের বাচ্চার ঘিলু বের করে দেবে সে।

তারপর...

দুই

প্রচণ্ড ধূলিঝড়ের মধ্যে পরদিন দুপুরে সীমান্তের কাছের বেলচিরাগ শহরে পৌঁছল সার্জেন্ট শহীদুল্লাহ ও হামিদা গুলিস্তানী। ঝড় অবশ্য

সুবিধেই করে দিয়েছে ওদের, নইলে তালেবান গার্ড বা পুলিস, যে কারও হাতে ধরা পড়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। সীমান্ত শহর বলে এদিকে কড়া পাহারা চলছে ওদের। রেল স্টেশন, বাস স্টপেজ, সবখানে গিজ গিজ করছে ওরা।

বাতাসে পাক্ খেতে থাকা ধুলোর সাথে তীক্ষ্ণধার বালির কণার আঘাত থেকে বাঁচার জন্যে আর সবার মত ওরাও চোখমুখ ঢেকে কোনমতে দৌড়ে পালাল স্টপেজ থেকে। একই কারণে গার্ডরা আগে থেকেই হাওয়া, কাজেই কোন বাধা এল না। নইলে আসত। বেলচিরাগের কয়েক মাইল আগে দুটো তালেবান চেক পোস্ট অতিক্রম করেছে বাস, যাত্রীদের প্রত্যেককে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে ওখানে। হামিদার বোবা স্বামীর অভিনয় করে বেঁচে গেছে শহীদ।

এখানে হয়তো তা হত না। নিশ্চই ভালমত চেক করা হত, শহরের কোথায় এসেছে ওরা, প্রয়োজনে তাও। সেক্ষেত্রে একজনেরও রেহাই পাওয়ার উপায় ছিল না। মিনিট পাঁচেক নীরবে হাঁটল দু'জনে। ছোট মফস্বল শহর যেমন অনগ্রসর হয়, এটা তার থেকেও বহুগুণ পিছিয়ে আছে। রাস্তায় তেমন মানুষজন নেই, ঘরবাড়ি ছাড়াছাড়া। সরু, খাওয়া খাওয়া রাস্তা। সবকিছুতে দারিদ্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট।

মুখ খুলল শহীদ, 'আর কতদূর?'

চোখ নাচিয়ে সামনের এক গলি নির্দেশ করল মেয়েটি। 'ওটায়।' পথচলার ক্লান্তি ছাপিয়ে স্বস্তি ফুটেছে তার চেহারায়। আর একটু গেলেই নিরাপদ আশ্রয়, কাজেই ফোটারই কথা। একটু বিশ্রাম, খাওয়া, তারপর···। শহীদের চিন্তার গাড়ি কড়া ব্রেক কষল হামিদাকে গলির মুখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে। সে-ও থেমে দাঁড়াতে যাচ্ছিল প্রায়, কিন্তু কড়া ট্রেনিং সময় থাকতে সতর্ক

করল, হামিদার বাহু ধরে ওকে টেনে নিয়ে চলল সে।

'থামবেন না, পা চালান!' বলল চাপা গলায়। কিন্তু কাজ হচ্ছে না দেখে মেয়েটিকে রীতিমত ফ্রগ মার্চ করিয়ে গলি বরাবর উল্টোদিকের ফুটপাথে এসে উঠল সে। ওপারের দৃশ্য দেখায় ব্যস্ত ছোট এক জটলার পাশ কাটিয়ে সামনের এক ঝুপড়ি চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ল। ভেতরটা একদম ফাঁকা, একজন খদ্দেরও নেই।

খুব সম্ভব ধূলিঝড়ের ফল, ভাবল শহীদ। আড়চোখে ওপারের গলির ভেতরে নজর বুলিয়ে বসে পড়ল সেদিক ফিরে। এক বাড়ির গেটে দুই পুলিস দেখে ভুরু কুঁচকে উঠল। 'চাচার বাড়ি?' বলল ফিসফিস করে।

'হ্যাঁ,' ঢোক গিলল হামিদা।

দোকানের পিছনের কিচেন থেকে এক বৃদ্ধ পাঠান বেরিয়ে এল। চওড়া গোঁফ তার। মানুষটাও কম চওড়া নয়। কাছে এসেই চেহারা বিগড়ে গেল তার মেয়ে দেখে।

'কিছু খাবার চাই,' বলল শহীদ। 'আর চা।'

মাথা দোলাল বৃদ্ধ। 'মেয়েমানুষ চায়ের দোকানে নিষিদ্ধ।'

'মাফ করবেন,' হাসির ভঙ্গি করে পকেট থেকে পুরু মানিব্যাগটা বের করল ও। প্রচুর আফগানিতে ঠাসা ওটা। 'আমরা মুসাফির, অনেক দূর থেকে এসেছি। আমার স্ত্রী অসুস্থ, তাই বাধ্য হয়ে এখানে ঢুকেছি। তাছাড়া আর কেউ তো নেই, তাই...খেয়েই চলে যাব আমরা।' একটা পঞ্চাশ আফগানি লোকটার হাতে গুঁজে দিল ও। 'একটুও দেরি করব না।'

'কিন্তু মেয়েমানুষ খাইয়ে বিপদে পড়তে পারি আমি,' বলল বৃদ্ধ। তবে এবার যথেষ্ট দ্বিধার সাথে। 'মুসাফির' শুনেই আফগান অন্তর তরল হতে শুরু করেছে।

'মাত্র পাঁচ মিনিট।'

খানিক ইতস্তত করল পাঠান, তারপর শ্রাগ করে ঘুরে দাঁড়াল। 'ভাল কথা,' পিছন থেকে বলে উঠল সার্জেন্ট। 'ওই বাড়ির সামনে পুলিস দাঁড়িয়ে আছে কেন? কি হয়েছে?'

'ওরা?' চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল তার। পরক্ষণে গলা খাদে নেমে গেল। 'ওটার মালিক নাকি বিশ্বাসঘাতক, তাই কাল রাতে পুলিস ধরে নিয়ে গেছে বাড়ির সবাইকে। তখন থেকেই আছে ওরা, বাড়ি পাহারা দিচ্ছে।'

'ও!' হতাশ হয়ে পড়ল শহীদ। এ শহরের কয়েকজন পয়সাওয়ালার একজন হামিদার চাচা। ব্যক্তিগত-গাড়ি আছে। ওরা প্ল্যান করে এসেছে গাড়িটা ধার নিয়ে পালাবে, হলো না। হামিদার দিকে তাকাল শহীদ। চোখ টলটল করছে ওর।

'চাচা-চাচী...!' বিড়বিড় করে বলল সে। 'তিন ভাই-বোন...!' ঢোক গিলল। 'সবাইকে ধরে নিয়ে গেছে? তাহলে নিশ্চই আমার মা, বড়বোনকেও...'

চুপ করে থাকল শহীদ। কি বলবে?

'আমার কাবুল ফিরে যাওয়া উচিত। নইলে সবাইকে মেরে ফেলবে ওরা।'

'ফিরে গেলে আপনাকেও ছাড়বে না,' বলল শহীদ। 'মাথা ঠাণ্ডা রাখুন, চট্ করে কোন সিদ্ধান্ত নিতে যাবেন না। তাতে পরিস্থিতি আরও জটিল হবে। দাউদ যখন আছে ওদের দলে, আমার মনে হয় না আপনার মা-বোনের কোন ক্ষতি হবে।'

দোকানের ভেতরে ভাঙাচোরা ক্যাশকাউন্টারে মালিকের রেডিও বাজছে। সন্ধের খবর হচ্ছে। আনমনে শুনছিল ওরা, হঠাৎ চোখ বড় বড় হয়ে উঠল হামিদার। 'কি হলো?' ঝুঁকে বসল শহীদ।

ইশারায় ওকে রেডিও দেখাল মেয়েটি। 'খবর!' রুদ্ধশ্বাসে বলল। 'আপনাদের খুঁজছে সিকিউরিটি!'

'আমাদের?'

'হ্যাঁ। বলছে একদল বিদেশী স্যাবোটিয়ার বাঘলান এয়ারপোর্ট থেকে পরশু রাতে একটা কপ্টার নিয়ে পালাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে, হিন্দুকুশের কোথাও ক্র্যাশ করেছে কপ্টার। জায়গাটার নাম শুনতে পাইনি।'

শক্ত হয়ে উঠল সার্জেন্টের সমস্ত পেশী। 'আর?'

'দলটাকে ধরা যায়নি, পালিয়ে গেছে সবাই। সরকার ওদের ধরতে জনসাধারণের সাহায্য চাইছে।'

'আচ্ছা!'

'হ্যাঁ। আট-নয়জন পুরুষ আর একজন মেয়ের এক দল...'

বাকি কথা কানে গেল না সার্জেন্টের। অন্য কথা ভাবছে সে। ক্র্যাশ কোথায় ঘটেছে আন্দাজ করার চেষ্টা করছে। থান্ডারবোল্ট টাইট শিডিউলের মধ্যে কাজ করছে। এরকম মুহূর্তে হিন্দুকুশে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে থাকে, নিঃসন্দেহে পুরো এলাকা জুড়ে কাল সারাদিন গিজগিজ করেছে পুলিস-তালেবান গার্ড। পারাচিনারও কাছেই, ওর মধ্যে আলফা পতেঙ্গা সেখানে ল্যান্ড করতে পেরেছে বলে মনে হয় না।

তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে থান্ডারবোল্ট কন্টিনজেন্সি প্ল্যান অনুযায়ী...এক ঝাঁকি খেয়ে সচকিত হলো সে। 'হামিদা! দক্ষিণে যাওয়া যায় কিভাবে?'

'দক্ষিণে!'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, দক্ষিণে!'

'কেন?'

'আগে পথ বলুন, তারপর বলছি।'

কলম্বো, শ্রীলঙ্কা।

তিনদিন আগে 'শুভেচ্ছা সফরে' আসা বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর গানবোট বিএনএস আলমগীরের রেডিওরুমে দাঁড়িয়ে আছে চিন্তিত ক্যাপ্টেন কামাল। এইমাত্র ঢাকার নির্দেশ পেয়েছে সে 'অপারেশন উদ্ধার' শুরু করার প্রস্তুতি নিতে হবে।

ফল-ব্যাক প্ল্যান কার্যকর করতে হবে শুনে পরিস্থিতি সুবিধের মনে হচ্ছে না তার। এর অর্থ থান্ডারবোল্ট সমস্যায় পড়েছে। একইসঙ্গে স্বস্তিও পাচ্ছে ওই দলে সে ছিল না বলে। অথচ বাদ পড়ায় সেদিন তার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মনে মনে আল্লাকে ধন্যবাদ জানাল ক্যাপ্টেন।

'তার মানে ওরা লেজের সাথে গোবর মাখিয়ে ফেলেছে!' বলল দলের অন্য সদস্য, সার্জেন্ট হুমায়ুন আহমেদ।

'অবস্থা সেরকমই মনে হচ্ছে। পুরো ডিটেইল্‌স্ জানানো হয়নি, তবে দলের সদস্য একজন নিখোঁজ।'

চমকে উঠল সার্জেন্ট। 'কে, স্যার?'

'নাম জানি না। বলেনি ওরা। তবে মিশন সফল।'

'আমি তাহলে যাত্রার আয়োজন সেরে ফেলি।'

মাথা ঝাঁকাল ক্যাপ্টেন। 'যাও।'

সার্জেন্ট বেরিয়ে যেতে নিজের চিন্তায় ডুবে গেল কামাল। বন্দর ছাড়ার কাগজ-পত্র তৈরি করতে গেছে হুমায়ুন, সে ফিরলে বাকি প্রস্তুতি সেরে নিতে হবে। কাল খুব ভোরে, 'বাংলাদেশের পথে' রওনা হয়ে যাবে বিএনএস তিতুমীর।

কলম্বো তাই জানবে। কিন্তু আসলে তা নয়, ভারত মহাসাগরের গভীরে পৌঁছে নাক ঘোরাবে সে, অনেকটা পথ ঘুরে এগোবে আরব সাগরের দিকে। তারপর পাক-আফগান বর্ডারের

বিশেষ এক জায়গায় পৌঁছে অপেক্ষায় থাকবে থান্ডারবোল্ট টীমের।

নতুন কোন সমস্যা যদি না ঘটে, চারদিন পর সেখানে পৌঁছবে ওরা।

অনেক উঁচু দিয়ে উড়ছে আফগান এয়ারফোর্সের এক রিকনাইসন্স অরিয়ন এয়ারক্র্যাফট। পাইলট-ক্রু কেউ খুশি নয় ওটার, বরং বিরক্ত।

পৃথিবীর সব দেশের মত আফগানিস্তানেও আন্তঃবাহিনী রেষারেষি আছে। এক বাহিনী অন্য বাহিনীর মাতবরী সহ্য করতে পারে না, যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে পরস্পরকে। তারপরও যদি বাধ্য হয়ে একসঙ্গে কাজ করতেই হয়; কাজ যতটা না হয়, তার চেয়ে বেশি হয় অকাজ।

তাই করছে এখন ওটার পাইলট-ক্রু। অন্তত ওদের সেরকমই ধারণা। কোথায় ইরান বর্ডারে থাকার কথা এখন ওদের, তা নয়, কোথাকার কোন আর্মি কর্নেলের অর্ডারে ভেরেন্ডা ভাজতে হচ্ছে। এই কি সহ্য করা যায়? ওদিকে যুদ্ধ বাধে বাধে অবস্থা, কত উত্তেজনা-টেনশন, সব ছেড়ে কি না দেশের ভেতরে আকাশ পাহারা দেওয়া!

কি?-না, সন্দেহ করা হচ্ছে একদল ইরানী ইনফিলট্রেটর ঢুকে পড়েছে দেশের মধ্যে। স্যাবোটাজ ঘটাতে পারে গুরুত্বপূর্ণ যে কোন ইনস্টলেশনে। ভাল কথা, তাই যদি হয়, সে সব আছে বড় বড় শহরে। বিরান হিন্দুকুশ রেঞ্জে আছে কোন্ কচু? ওখানে কেন চক্কর দিতে বলা? দেশের এমন চরম গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে অরিয়নের মত হাইলি এফিশিয়েন্ট এক ইনফ্রা-রেড নাইট সেনসরকে এমন এক কম গুরুত্বের কাজে আটকে রাখা ঠিক হয়েছে হাই কমান্ডের?

আপনমনে মাথা নাড়ল পাইলট—হয়নি।

ওদিকে লাইনস্ক্যান স্ক্রীন অপারেটর অপলক চোখে তাকিয়ে আছে পর্দার ইমেজগুলোর দিকে। থেকে থেকে এক-আধটা হীট-সোর্স ভেসে উঠছে। হিন্দুকুশ মাউন্টেন রেঞ্জের রাস্তায় চলাচলকারী ভেহিকেল ওসব। তাও খুবই কম। কিন্তু ওর কোনটা নয়, অপারেটর জানে। তাকে দেখতে হবে পথ ছেড়ে বেপথে চলছে কি না দুটো গাড়ি, পরিষ্কার নির্দেশ আছে কর্নেল মুরাদের। বেপথে এবং অস্বাভাবিক গতিতে ছুটছে কিনা, সেদিকে নজর রাখতে হবে শুধু।

পাগল আর কি! মনে মনে হাসল লোকটা। হিন্দুকুশে দিনের বেলাতেই ড্রাইভ করা কঠিন, সেখানে কি না রাতে চলবে গাড়ি? তাও বেপথে আর অস্বাভাবিক গতিতে? পাগল নয়, এই কর্নেল লোকটা আসলে উন্মাদ। বদ্ধ উন্মাদ। নইলে এরকম...সিগারেট ধরাতে গ্যাস লাইটার জ্বেলেছিল সে, হঠাৎ জমে গেল। আড়ষ্ট হয়ে উঠল দু'কাঁধ। লাইটার জ্বলছে খেয়াল নেই, চোখ বড় করে মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছে। চেহারা হয়েছে আস্ত উজবুকের মত।

খুদে একজোড়া ডট দেখছে সে পর্দায়, দুটো হীট-সোর্স! কোন রাস্তার বাড়ির ধারেও নেই ওগুলো, একটানা দক্ষিণে চলেছে। গতি কম করেও ত্রিশ মাইল! এ কি অসম্ভব কথা! এমন অদ্ভুত...আঙুলে ছ্যাঁকা খেয়ে লাইটার ছেড়ে দিল অপারেটর, হুমড়ি খেয়ে পড়ল মনিটরের ওপর।

এক মিনিট পর ইন্টারকমের সুইচের দিকে হাত বাড়াল সে, টিপে দিল। 'মনে হয় ও দুটোর দেখা পেয়েছি আমি।'

হিন্দুকুশ রেঞ্জ।

সন্ধের পর ক্যাম্প গুটিয়ে গন্তব্যের দিকে রওনা দিল

থান্ডারবোল্ট টীম। যাত্রার শুরু থেকেই কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল রানার, সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে তা বেড়েই চলল। সুবিধের লাগছে না।

ও জানে এই লক্ষণটা ভাল নয়। অভিজ্ঞতা বলছে সামনে কোন ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছে ওরা। এবং মাঝরাতের আগেই প্রমাণ হলো সবকিছু ঠিকঠাকমত চলছে না।

আগের মত আজও পিছনে রয়েছে পিঙ্ক প্যান্থার টু, ফয়েজ মোহাম্মদ চালাচ্ছে। এক ঢাল বেয়ে নামার সময় আওয়াজটা প্রথম কানে এল রানার। দূরাগত গুনগুন ধরনের। নামার সময় গতি কমিয়ে দিয়েছিল ফয়েজ, এঞ্জিনের আওয়াজ প্রায় নেই হয়ে গিয়েছিল কিছু সময়ের জন্যে, তাই শোনা গেল। নইলে কতক্ষণে টের পাওয়া যেত কে জানে!

ফয়েজকে থামতে বলবে বলে মুখ খুলতে যাচ্ছিল ও, কিন্তু দরকার হলো না। এক মুহূর্ত পর সে-ও শুনল, সঙ্গে সঙ্গে দাঁড় করিয়ে ফেলল গাড়ি। এঞ্জিন অফ করে কান পাতল। 'বস্!'

'শোনো!' কান খাড়া করল রানা। এবার অনেক স্পষ্ট শোনা গেল আওয়াজ। প্লেন! দুই জানালা দিয়ে উঁকি দিল ওরা, পিছনের অন্যরাও। আকাশের বুক সার্চ করতে লাগল কয়েক জোড়া চোখ। কিছুই দেখা গেল না। বেশ কিছু সময় অপেক্ষা করেও কাজ হলো না। আওয়াজ আছে, অথচ আওয়াজ সৃষ্টিকারীর দেখা নেই।

এক ঘণ্টার মধ্যে আরও দু'বার থামল ওরা। দু'বারই আওয়াজ পাওয়া গেল—দূরাগত, চাপা, তবে অদ্ভুতরকম ভীতিকর। এর কোন অর্থ খুঁজে পেল না মাসুদ রানা।

'কি মনে হয়, বস্?' একসময় প্রশ্ন করল ফয়েজ।

নাকের ডগা চুলকাল ও। 'টার্বো প্রপ মনে হয়, হেভি ট্রান্সপোর্ট।'

'ফলো করছে আমাদের?' যূথী জানতে চাইল।

'দৈব সংযোগও হতে পারে,' বলল ডন।

'না,' মাথা দোলাল রানা। 'অনুসরণই করছে।'

জাহাঙ্গীর ঝুঁকে বসল। 'আমারও তাই মনে হয়, বস্,' বলল সে। 'রিকনাইসন্স প্যাট্রল। হতেই হবে। ব্যাটা এক ঘণ্টারও বেশি আমাদের পিছু লেগে আছে।'

'হারকিউলিস...' রানাকে মাথা দোলাতে দেখে থেমে গেল ফয়েজ।

'অরিয়ন, হয়তো।'

'সেটা কি?' প্রশ্ন করল যূথী।

'ফরাসী মেরিটাইম প্যাট্রল এয়ারক্র্যাফট। কিছুদিন আগে ওর দুটো কিনেছে এরা।'

'আমাদের লেজে লেগে বিসমিল্লা করল নাকি?' বলল ফয়েজ। 'ভাল মুসিবতের কথা হলো তো!'

'তা ঠিক,' মাথা দোলাল ও। 'ইনফ্রা-রেড ব্যবহার করে অন্ধকারে ট্র্যাক করতে পারে ওগুলো। তবে আমাদেরগুলোর মত এত কার্যকর নয়, সবখানে ট্র্যাক করতে পারে না। এরকম খোলামেলা জায়গার কথা অবশ্য আলাদা। এখানে ওরা আমাদের স্পষ্ট দেখতে পাবে।'

রেডিওর দিকে তাকাল রানা। 'সদরউদ্দিনকে সতর্ক করা দরকার। বিপদের ভয়ে বসে থাকলে আমাদের চলবে না। ফয়েজ, জোরে চালাও। ওয়ানের সাথে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেলে সর্বনাশের ষোলো কলা পুরো হবে।'

গাড়ি ছোটাল ফয়েজ, দেখতে দেখতে ঝড়ের গতি পেল পিঙ্ক প্যান্থার টু। নিজেকে আফগান সার্চ পার্টির জায়গায় বসিয়ে পরিস্থিতি নিয়ে খানিক মাথা খাটাল রানা, বুঝে ফেলল ওরা জাল

গুটিয়ে আনছে। ওর আগের সমস্ত ডাইভার্শনারি ট্রিক্ কাজে লাগলেও আজ লাগছে না, কর্নেল মুরাদ ধরে ফেলেছে ওর চালাকি, খুব সম্ভব। ওপরের প্লেনটা যদি সত্যিই অরিয়ন হয়ে থাকে, ওটা তাহলে তারই প্রমাণ।

থান্ডারবোল্টকে কেবল পিন-পয়েন্ট করা বাকি ওদের, সে কাজ সারা হলেই ইউনিটের পর ইউনিট আর্মি পাঠিয়ে সমস্ত রাস্তা ব্লক করে দেবে কর্নেল। ওদের এগোবার কোন পথই রাখবে না। ওরা তখন কপ্টার মোবিলিটির সুবিধেও পাবে।

ঠিক পথেই যাচ্ছে কি না চেক করে দেখার জন্যে থামতে হলো ওদের নির্দিষ্ট সময়ে। সেক্সট্যান্ট আর ক্রোনোমিটার নিয়ে নেমে পড়ল মাসুদ রানা, পরেরটার নির্দিষ্ট সময় সঙ্কেত অনুযায়ী সেক্সট্যান্টে তিন-নক্ষত্রের 'নির্দেশ' নিল খুব সতর্কতার সাথে। হিসেবে একচুল হেরফের হয়ে গেলেই সর্বনাশ ঘটে যাবে। এই সামান্য ব্যবধানই সকালে দেখা যাবে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে কম করেও ত্রিশ মাইল দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে ওদের।

তার ওপর পাহাড়ী অঞ্চলে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়াও আরেক মহাসমস্যা। প্রতিটি নক্ষত্রের অ্যাঙ্গেল দিগন্তের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, নইলে 'নির্দেশ' বেকার। কাজেই দু'বার কাজটা করতে হলো ওকে, যখন দেখা গেল ঠিক আছে, ভুল হয়নি কোন, আবার গড়াতে শুরু করল দুই বাহন।

কিছু সময়ের জন্যে ভাবনায় ডুবে থাকল ও। ভরসা করতে সাহস হয় না, তবু ভাবল প্লেনটা হয়তো এখনও লোকেট করতে পারেনি ওদের। হয়তো শেষ পর্যন্ত আফগানদের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারবে টীম। নইলে মহাবিপদ। যত বাধা বিপত্তিই ঘটুক, তিনদিন পর জায়গামত পৌঁছতেই হবে ওদের। যদি তা সম্ভব না হয়, কন্টিনজেন্সি প্ল্যানও মাঠে মারা যাবে।

একটা প্রশস্ত মুখের শুকনো নদীর মত ওয়াদিতে নেমে পড়ল ওরা। মেঝে প্রায় সমতল এটার, কাজেই তুমুল গতিতে ছুটল ল্যান্ড রোভার। যত এগোচ্ছে, দু'পারের তীরও ততই খাড়া হচ্ছে ক্রমে। থান্ডারবোল্টের প্রত্যেকের জানা আছে এর শেষ মাথা পাহাড়ে, সঙ্কীর্ণ এক ফাটলের মত। ওখানে পৌঁছে পাথরের উঁচুনিচু শেলফের মত রাস্তা ধরে আরও কয়েক মাইল গেলে তবে সমতল, হায়ার গ্রাউন্ড পাওয়া যাবে। অ্যামবুশের জন্যে ফাটলটা আদর্শ এক জায়গা।

পরিস্থিতি এতটা কঠিন না হলে বা হাতে সময় থাকলে অন্য ব্যবস্থা নিত মাসুদ রানা। ওয়াদির দুই তীর দিয়ে রিকনাইসন্স স্কোয়াড পাঠিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিত এগোবার আগে। কিন্তু এখন সে বিলাসিতার উপায় নেই। সমস্যাগুলো সদরউদ্দিনকে জানাতে তাজ্জব হয়ে গেল সে প্রথমে। 'এয়ারক্র্যাফট? কই, আমরা তো শুনিনি আওয়াজ!' সামলে নিয়ে আবার বলল, 'গুলি মারেন, বস্। ওয়াদি ছেড়ে বের হতে পারলে ভাল কাভার পাওয়া যাবে। আরেকটু ফাস্ট আসেন। আউট।'

আলাপ শেষ হয়েছে দেখে ওর দিকে ঝুঁকে বসল সাংবাদিক। 'কোন নতুন সমস্যা হয়েছে, মেজর?'

'নাহ্, কোন সমস্যা নেই। হলে সামনের ওরা জানাবে আমাদের, নিশ্চিন্ত থাকুন,' বলল বটে ও, তবে গলার স্বরে যে আগের আত্মবিশ্বাস নেই, তা-ও টের পেল।

নীরবতা নেমে এল টুর ভেতরে, ভারী পাথরের মত চেপে বসল। গাড়ি ছুটছে তো ছুটছেই, যেন পথের কোন শেষ নেই। যুগ যুগ ধরে ছুটছে ওরা, আরও যুগ যুগ যেতে হবে।

আধ ঘণ্টা পর সবাইকে চমকে দিয়ে খড়মড় করে উঠল রেডিও। 'ওয়ান টু টু!' ব্যস্ত গলা শোনা গেল সদরউদ্দিনের।

বিপদের আশঙ্কায় ঝট্ করে সোজা হয়ে গেল রানা, থাবা দিয়ে মাইকের সুইচ অন করল। 'টু, সেন্ড! ওভার!'

হঠাৎ ওয়াদির উঁচু দেয়াল ডিঙিয়ে একেবারে মাথার ওপর চলে আসা এক কপ্টারের বিকট আওয়াজের তলায় লোকটার গলা চাপা পড়ে গেল। আচমকা আপদটাকে দেখতে পেয়ে পয়লা চোটে বেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল রানা, তাজ্জবও হলো একেবারে বিনা শব্দে ওটা এত কাছে কি করে পৌঁছল ভেবে। অবশ্য পরক্ষণেই বুঝল বাতাসের উল্টোদিক দিয়ে এসেছে চতুর পাইলট, তাই কিছুই টের পায়নি ওরা। ট্রুপ ট্রান্সপোর্ট ওটা।

ফড়িংটার রোটরের আওয়াজ ওয়াদির খাড়া দেয়ালে বাড়ি খেয়ে এত বিকট প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল যে মুহূর্তে কালা বনে যাওয়ার অবস্থা হলো সবার। ওটা উদয় হওয়ার পর দুই কি তিন সেকেন্ড পেরিয়েছে, এই সময় ওয়াদির ডানদিকের উঁচু দেয়ালের ওপরে অনেকগুলো অস্ত্র একযোগে ঝল্‌সে উঠল। দুটো মিলে শোনাল দূরাগত বরফধস আর ঘন ঘন বজ্রপাতের মিলিত আওয়াজের মত।

কয়েক মুহূর্ত মাথার ওপর ঝুলে থাকল কপ্টার, প্রচণ্ড ধুলোর ঝড়ে অন্ধ হয়ে গেল সবাই। তারপর ডানদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা, পরক্ষণে এল বুলেটের দ্বিতীয় পশলা। ছুটন্ত প্যান্থার টুর সাইড ঘেঁষে ওয়াদির বেডে লম্বা সেলাইয়ের ফোঁড় তৈরি করে দিয়ে গেল ঝাঁক-ঝাঁক বুলেট। একটু পর অন্য পারেও অসংখ্য রাইফেলের গান ফ্ল্যাশ দেখা গেল। ঠক্-ঠক্ আওয়াজ উঠল গাড়ির বডিতে, কম করেও আধ ডজন বুলেট বিঁধেছে।

থামল না প্যান্থার, বরং আরও বেড়ে গেল গতি। নাইট স্কোপে চোখ রেখে তাকাল মাসুদ রানা, সামনের প্রতিরোধ বাহিনী কতবড় বোঝার চেষ্টা করছে। তুমুল গোলাগুলি চলছে। শুধু

রাইফেল নয়, ওর মধ্যে বেল্ট-ফেড মেশিনগানও আছে। ইনফ্যান্ট্রি ইউনিট। ওয়াদির দুই তীরে ওরা এমনভাবে অবস্থান নিয়েছে, অন্ধকারে এমনভাবে ফ্ল্যাশ করছে ওদের গান মায্‌ল্‌, মনে হয় জ্বলন্ত নেকলেস বুঝি।

এরকম মুহূর্তে প্রথম কাজ হচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ভাগা। হয় উল্টোদিকে, নয়তো সোজা অ্যামবুশের মধ্যে দিয়ে ফুল স্পীডে। পরেরটা করছে হেকমত ও ফয়েজ। আর্ফগানরা ভেবেছিল আচমকা হামলার মুখে পড়ে হতভম্ব হয়ে যাবে থান্ডারবোল্ট টীম, এগোবে না পিছাবে বুঝে উঠতে না পেরে অল্প সময়ের জন্যে হলেও দ্বিধায় ভুগবে। এই সুযোগে ওরা এগিয়ে আসবে।

কিন্তু ফল অন্যরকম হলো দেখে নিজেরাই দ্বিধায় পড়ে গেল। এই জাতীয় পরিস্থিতি মোকাবিলার রিঅ্যাকশন-ট্রেনিং নিয়ে হাফেজ হয়ে গেছে হেকমত ও ফয়েজ, তাই বিন্দুমাত্র সুযোগ দিল না। আক্রমণ শুরুর দুই সেকেন্ড পুরো হওয়ার আগেই স্টিয়ারিং হুইল হাবে সেট করা স্মোক-বাটন টিপে দিল ফয়েজ, চোখের পলকে সামনের ও পিছনের স্মোক ডিসচার্জ ইগনাইটর ঝল্‌সে উঠল, ছয়টা করে এল-সেভেন গ্রেনেড ছুটে গেল দুদিকে। সবগুলো প্রায় একসঙ্গে বিস্ফোরিত হলো, শত্রু ব্যাপার টের পাওয়ার আগেই গাঢ় সবুজ ধোঁয়ায় আঁধার হয়ে গেল পুরো ল্যান্ডস্কেপ।

প্যান্থার টু গায়েব হয়ে গেছে তার মধ্যে।

ওদিকে গুলি শুরু হওয়ামাত্র ডন ও যূথীকে টান মেরে মেঝেতে ফেলে দিয়েছে খন্দকার জাহাঙ্গীর, নিজেও শুয়ে পড়েছে পাশে। আর রানা স্কোপ ছেড়ে এক ঝটকায় বনেটে ফিট করা টুইন-মাউন্টেড জিপিএমজি পজিশনে নিয়ে এসেছে, ল্যান্ড

রোভারের উন্মত্ত লাফঝাঁপ সামলে সুযোগের অপেক্ষায় আছে ও।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র, তারপরই হুশ্ করে মেঘ পিছনে ফেলে বেরিয়ে এল ওরা। সামনের ওয়াদি বেসিন দিনের মত আলো হয়ে আছে শত্রুর ছোঁড়া ফ্লেয়ারের আলোয়। সামনে ওয়ানকে দেখতে পেল রানা, তাড়া খাওয়া শেয়ালের মত লেজ দাবিয়ে ভাগছে প্রাণপণে। ওদের একটু সামনে ওয়াদির শুকনো মাটি খুঁড়ে লাইন দিয়ে বসে আছে আরও একদল রেগুলার আর্মি, এখনই গোলাগুলি শুরু করবে।

সামনের প্যাসেঞ্জার'স সীটে প্রায় দাঁড়িয়ে আছে সদরউদ্দিন, তার জিপিএমজির লম্বা ব্যারেল অনবরত আগুন উদগীরণ করে চলেছে। হেকমত আলিকে আচমকা শত্রু লাইনের দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে দিতে দেখে গাল কুঁচকে উঠল রানার। তাড়াহুড়ো করে পজিশন নিতে হয়েছে বলে গর্ত তেমন গভীর করার সুযোগ পায়নি ওরা, সবারই পিঠ জেগে আছে সারফেসের ওপর। ওকে গাড়ি ঘোরাতে দেখে রানা যে আশঙ্কা করেছিল, তাই ঘটল। চোখের পলকে সবচেয়ে কাছের ট্রুপারের ওপর গাড়ি তুলে দিল হেকমত, দেহটাকে পিষে চিঁড়েচ্যাপ্টা করে দিয়েই আবার ছুট্। তার মেশিনগান উড়ে গিয়ে পড়ল পাশেরজনের মাথায়, হেলমেট-মাথা, দুটোই গুঁড়িয়ে গেল লোকটার।

ওদের মুখোমুখি পাল্টা আক্রমণে হতচকিত হয়ে পড়ল বাকি ট্রুপাররা, দুই-একজন দাঁড়িয়ে পড়ল বোকার মত। রানার জিপিএমজির সংক্ষিপ্ত ব্রাশ পরমুহূর্তে শুইয়ে দিল তাদেরকে। বাকি সবাই অস্ত্র ফেলে ঝেড়ে দৌড় লাগাল ওয়াদির কিনারার দিকে, একজন টুর একেবারে সামনে পড়ে গেল। ফয়েজ চেষ্টা করলে হয়তো পাশ কাটিয়ে যেতে পারত, কিন্তু চেষ্টা করল না।

দড়াম করে তার মেরুদণ্ডের গোড়ায় গুঁতো মারল প্যান্থার টু,

লোকটাকে জাহাজের ফিগারহেডের মত নাকে বাধিয়ে নিয়ে ছুটল খানিকটা, তারপর গড়িয়ে পড়ে গেল ট্রুপার। গলা আর বুকের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেল ষোলো ইঞ্চি চওড়া হেভি স্যান্ড টায়ার। কিন্তু তেমন ব্যথা অনুভব করল না লোকটা, কারণ প্রথম ধাক্কায়ই মেরুদণ্ড পাটকাঠির মত ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গিয়েছিল তার, ব্যথা টের পাওয়ার মত বোধ ছিল না। তাকে পিষে দিয়েই হাওয়া হয়ে গেল প্যান্থার টু।

কখন যেন মাথা তুলেছিল ডন, ফয়েজ মোহাম্মদের প্রথম পর্যায়ের ফিনিশিং টাচ্ দেখে আহাম্মক বনে গেল। হুঁশ হতে 'ইয়া মাবুদ!' বলে চেঁচিয়ে উঠল সে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ধরে ঠেসে তাকে শুইয়ে দিল জাহাঙ্গীর। 'আরে শুয়ে থাকেন! দেশে ফিরতে পারলে জায়নামাযে বসে ওনাকে ডাকার অনেক সময় পাবেন।'

ওদিকে রানা সাইড বিন থেকে থাবা দিয়ে এক বাক্স গুলি বের করল। সীল ভেঙে নতুন বেল্ট বের করে জিপিএমজির ব্রীচে ভরে পরের রাউন্ডের জন্যে তৈরি হয়ে নিল।

সামনে, ওয়াদি থেকে বের হওয়ার সরু ফাটলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে প্যান্থার ওয়ান। উঁচু-নিচু পাথরের শেলফে ছড়িয়ে থাকা পাথরের টুকরো আর ছোট বোল্ডারের ওপর দিয়ে নাচতে নাচতে ওপরদিকে উঠতে শুরু করেছে। ফয়েজ ওটাকে অনুসরণ করার জন্যে গিয়ার শিফট করল, ঠিক তখনই পিছন থেকে জাহাঙ্গীর চেঁচিয়ে উঠল, 'কপ্টার, বস্!' পরক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়ল পিছনের পিন্টল মাউন্টিং জিপিএমজির ওপর।

ঝুঁকে ওপরে তাকাল রানা—সেই ট্রান্সপোর্ট কপ্টার। দৈত্যাকার এক চিনূক। পিছন থেকে জাহাঙ্গীর এক পশলা গুলি ছুঁড়ল, কিন্তু উচ্চতা বেশি বলে ওটার ধারেকাছেও পৌঁছল না বুলেট। তখনই

শেলফে উঠল টু, ঝড়ে পড়া নৌকার মত দোল খেতে খেতে টালমাটাল হয়ে ছুটল ওয়ানের পিছন পিছন। ওটাকে সোজা রাখার জন্যে হুইলের ওপর সর্বশক্তি খাটাতে হচ্ছে ফয়েজকে, চেহারা ঘেমে চক্‌চক্ করছে তার। শার্ট ভিজে সেঁটে আছে গায়ের সাথে। দাঁত বেরিয়ে আছে সার্বক্ষণিক জমাট বাঁধা হাসির মত।

ওদিকে পিছনে, আড়ালে চলে গেছে চিনূক। নিশ্চয়ই ট্রুপস্ নামাতে। হ্যাঁ, তাই। ওয়াদির কিনারায় কয়েকটা ছায়া দেখা গেল একটু পর। আকাশের গায়ে ওদের কাঠামো গোনার চেষ্টা করল রানা, প্রথমে মনে হলো তিনটে। তারপরই আরও কয়েকটা যোগ হলো। এরমধ্যে একটু দূরে সরে আসায় জাহাঙ্গীর অ্যাঙ্গেলে পেয়ে গেছে ব্যাটাদের, কিন্তু প্যান্থারের লাফালাফির জন্যে কিছুই করতে পারছে না।

ঢাল পার হয়ে উঠতে প্রচুর সময় নষ্ট হচ্ছে, মনে হলো যেন যুগ যুগ লেগে যাচ্ছে এই সামান্য জায়গা অতিক্রম করতে। পিছনের শত্রু বাহিনী ততক্ষণে পজিশন নিয়ে ফেলেছে। উঁচুতে থাকার অ্যাডভান্টেজের সাথে পাথরের শেল্টারও পাচ্ছে, অতএব বিপুল বিক্রমে কাজে লেগে পড়েছে।

অন্ধকারে ঘন ঘন ফ্ল্যাশ করছে তদের গান মায্‌ল্, তির্যক রেখা ধরে দুই প্যান্থারের দিকে ছুটে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট। ঠুস্ ঠাস্ করে সেঁধিয়ে যাচ্ছে বডিতে, কাঁচ চুরমার হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। একটুপর হঠাৎ টুর নিচে দুটো চাপা ফুট! আওয়াজ উঠল, পরমুহূর্তে ডান দিকে অনেকটা কাত হয়ে গেল গাড়ি। মনে হলো সাসপেন্নশন ভেঙে গেছে।

'যাহ্!' দাঁতের ফাঁক দিয়ে বলে উঠল ফয়েজ। 'টায়ার...!'

'এটার মায়া ছাড়তে হয় এবার,' মরিয়া হয়ে শান্ত গলায় বলতে চাইল রানা। কিন্তু শোনাল একেবারে উল্টো। 'আউট!

জলদি শেল্টার নাও সবাই!'

লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল জাহাঙ্গীর, ডনকে নিয়ে একছুটে ওয়াদির দেয়াল আর ল্যান্ড রোভারের মাঝের সরু ফাঁকে ঢুকে পড়ল। রানা বেরিয়ে এসে থাবা দিয়ে ধরল যূথীকে, কয়েক হ্যাঁচকা টানে ওকে ডনের কাছে নিয়ে বসিয়ে দিয়ে হেকলার অ্যান্ড কচ্ তুলে ওপরদিকে তাকাল। বৃষ্টির মত গুলি ছুঁড়ছে আফগানরা, মাথার ওপরের এখানে ওখানে আছড়ে পড়ছে বুলেট, ছিট্‌কে উঠে দিগ্বিদিক ছুটছে। পাথরের টুকরোও আছে তার সাথে।

অস্ত্র নামিয়ে নিল রানা। ওদের ঠেকাতে অন্য কিছু লাগবে, এতে কাজ হবে না। পাথরের আশ্রয় ছেড়ে বের হতে বাধ্য করতে হবে ব্যাটাদের। সামনের আড়াল থেকে প্যান্থার ওয়ান সে চেষ্টা করছে অবশ্য, কিন্তু তাতে কাজ হচ্ছে না।

ওদের চাইতে উঁচুতে উঠতে হবে, ভাবল রানা। কিন্তু কি করে? জায়গা ছেড়ে নড়াই যাচ্ছে না গুলির ঠ্যালায়। তবু ভাগ্য ভাল যে নাইটসাইট নেই ব্যাটাদের, থাকলে এতক্ষণে পাখির মত একজন একজন করে টার্গেট প্র্যাকটিস শুরু করে দিত ওদের ওপর। কি করা যায়? মরিয়া হয়ে ভাবতে লাগল ও। হঠাৎ সাইড বিনে রাখা খুদে ফিন গ্রেনেডগুলোর কথা খেয়াল হলো। এত হুলস্থুলের মধ্যে ওগুলোর কথা মনেই ছিল না।

সাবধানে মাথা তুলল ও, বিনে হাত ভরে কয়েকটা গ্রেনেড আর পিচ্চি লঞ্চার বের করে আনল। ব্যস্ত হাতে ওটায় গ্রেনেড ভরে উঁচুতে টার্গেট করল, সৈন্যদের অবস্থান লক্ষ্য করে। পরমুহূর্তে টিপে দিল ট্রিগার। জোর এক 'টং!' শব্দের সাথে উড়ে গেল ফিন গ্রেনেড, মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

একটুপরই জায়গামত বিস্ফোরিত হলো ওটা। শূন্যে আগুনের গোলা লাফিয়ে উঠতে দেখা গেল, একই সঙ্গে কয়েকটা কাতর

ধ্বনিও উঠল. গোলাগুলির তেজ কমে এল ঝপ্ করে। তৃপ্তির সাথে আরেকটা ছুঁড়েই সঙ্গে সঙ্গে আবার তৈরি হয়ে নিল রানা। দ্বিতীয়টা ফেটেছে এরমধ্যে, সব অস্ত্র থেমে গেছে আফগানদের, চিৎকার আর গোঙানির দূরাগত আওয়াজ আসছে কেবল। মনে হলো কয়েকজন পালাচ্ছে।

তৃতীয়টাও ছুঁড়তে যাচ্ছিল, এমন সময় আওয়াজটা শুনতে পেয়ে থমকে গেল রানা। চিনূক! আবার আসছে। লঞ্চার আকাশে তাক্ করে স্থির হয়ে থাকল ও। সঙ্গীরাও অনড়, হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে বিস্ফারিত চোখে।

পনেরো সেকেন্ড পর দেখা দিল টুইন রোটরের অতিকায় দানব, ওয়াদি পেরিয়ে ওপারে যাচ্ছে। আপনাআপনি ট্রিগারে তর্জনী চেপে বসল রানার, নাক প্রায় কিনারা পেরিয়ে গেছে ওটার, এইসময় হঠাৎ ভীষণভাবে দুলে উঠল, পরমুহূর্তে ঘটল বিস্ফোরণ। কান ফাটানো বিকট আওয়াজের সাথে হাজার টুকরো হয়ে চতুর্দিকে ছুটল চিনূক ও তার যাত্রীদের ছিন্নভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। কিছু পড়ল ওয়াদির ভেতরে, তবে বেশিরভাগ বাইরে। এক সৈনিকের গোটা একটা পা পাক্ খেতে খেতে নেমে এল, থপাস্ করে আছড়ে পড়ল যূথী আর ডনের ঠিক মাঝখানে। ছিট্‌কে উঠল রক্ত।

হাউমাউ করে কেঁদে উঠে দৌড় লাগাতে যাচ্ছিল মেয়েটা, টেনে ধরে ঠেকাল ফয়েজ আহমেদ। রানার এদিকে খেয়াল নেই, চোখ কপালে তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। কপ্টারের একটা রোটর ব্লেড স্লো-মোশনে, বাতাসে কাস্তের মত কোপ মারতে মারতে নেমে আসছে, সম্মোহিতের মত ওটার পতন দেখছে ও। সোজা এদিকেই আসছে।

সবাইকে সতর্ক করার জন্যে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু

শেষ মুহূর্তে সামলে নিল ওটাকে দিক্ বদল করতে দেখে। প্যান্থার টুর ওপর দিয়ে বাতাসে তীক্ষ্ণ শিস কেটে ছুটে গেল রোটর ব্লেড, জোর ঠং! শব্দে প্রথম আছাড় খেল পাথরে; আর দেখা গেল না কিছু। অন্ধকারে ভাঙাচোরার আওয়াজ শোনা গেল কেবল। তারপর সব চুপচাপ।

অসহ্য, অখণ্ড নীরবতা।

উঠে দাঁড়িয়ে ধুলো ঝাড়তে শুরু করল ফয়েজ, জাহাঙ্গীর, ডন ও যূথী। সবাই চুপ। মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছে যেন।

এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সচকিত হলো মাসুদ রানা। হাত তুলে পকেট ফোন অন করে বলল, 'টু টু ওয়ান। তোমরা ঠিক আছ? ওভার।'

'ওয়ান টু টু!' সঙ্গে সঙ্গে সদরউদ্দিনের উল্লসিত গলা শোনা গেল। 'একদম ঠিক আছি, বস্! ওভার।'

'আউট।' গ্রেনেড-লঞ্চার বিনে রেখে ফয়েজের দিকে তাকাল ও। 'গাড়ি খোলা জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। এখানে টায়ার বদলানো সম্ভব না, উচিতও হবে না।'

মাথা দোলাল লোকটা। আবার ফোনে কথা বলতে শুরু করল রানা।

তিন

বাঘলান। ভোর পাঁচটা।

রহস্যময় রেইড়ার পার্টির হাতে সরকারী বাহিনীর নাস্তানাবুদ হওয়ার খবর পেয়ে চুপ করে থাকল কর্নেল নাজাফ মুরাদ। খবরটা জানিয়েছে তার এইড। সুইপ সার্চ ব্যর্থ হওয়ায় মিশনের দায়িত্ব সেই লেফটেন্যান্টকে দিয়ে ঘণ্টা দুয়েক আগে ফিরে এসেছে সে। এইডকেও রেখে এসেছে।

একটু ঘুমিয়ে নেয়ার চিন্তা ভাবনা করছিল কর্নেল ওদিকের কোন খবর নেই দেখে। সবে চোখ লেগে এসেছে, এমন সময় বেজে উঠল ফোন। আর এল তো এল, তা-ও এই খবর। উপায় নেই দেখে এত ট্রুপার আর চিনূক হারানোর দুঃখ দ্রুত হজম করে ফেলল সে, বিষয়টা নিয়ে ভাবতে বসল।

লড়তে গেলে ক্ষয়ক্ষতি হবেই, তা নিয়ে হায় আফসোসের কোন অর্থ হয় না। কিছু সেনা সদস্য মরেছে মরুক, একটা কপ্টার গেছে যাক্, ওসব গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই প্রথমবারের মত শয়তানের দলের সাথে সরাসরি মোলাকাত ঘটেছে। পালিয়ে গেলেও মাঠ যে একেবারে ফাঁকা নয়, ওরা চাইলেই যে ইচ্ছেমত গোল করতে পারবে না, সেটা বুঝিয়ে দেয়া গেছে ওদের। সেই সাথে এটাও আরও পরিষ্কার হয়েছে যে কর্নেলের ধারণা ঠিক।

দক্ষিণেই যাচ্ছে ওরা।

তার মানে পাক-আফগান বর্ডার হয়ে বেরিয়ে যেতে চাইছে, নিশ্চয়ই সাগরে অপেক্ষমাণ শিপে চড়ে ভাগবে। সেটি হচ্ছে না। কিন্তু এদিকে আরেক সমস্যা ঘণ্টায় ঘণ্টায় জটিলতর হয়ে উঠছে। কয়েকজন ইরানী কূটনীতিক কাবুল থেকে নিখোঁজ হয়ে গেছে বলে কাবুলের ওপর খেপে গেছে তেহরান। হুমকি-ধমকি দিয়ে অস্থির করে তুলেছে। শুধু তাই নয়, সীমান্তে প্রচুর সৈন্য-সাঁজোয়া গাড়ি ইত্যাদি জড়োও করেছে। খুব বেশি বাড়াবাড়ি করছে ওরা।

এই জন্যে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় রাখা হয়েছে আফগান সেনাবাহিনীকে। ওদের সাহায্য পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। আরও আছে, এ মুহূর্তে ওদের যে ইউনিটকে কাজে লাগাচ্ছে কর্নেল, উল্টে তাদেরও যে কোন মুহূর্তে হাতছাড়া হওয়ার ভয় আছে। আছে মানে ছিল, এখন নেই। সে পথ বন্ধ করে দিয়েছে মুরাদ।

একটামাত্র রেডিও দিয়েছে সে ওদের, তাও এইডের হাতে, এবং কর্নেলের নিজস্ব ফ্রিকোয়েন্সিতে সেট করা আছে ওটা। এতে করে কাবুল হাই কমান্ড চাইলেও সরাসরি ওদের সাথে আর যোগাযোগ করতে পারবে না, ফ্রন্টের দিকে মার্চ করার নির্দেশ দিতে পারবে না। ভেবেচিন্তে ঠিক করল কর্নেল, ইরানকে পুঁজি করেই কাজ সারবে সে। নইলে বাংলাদেশের কথা বলে নতুন কোন সুবিধে আদায় করা যাবে না। অন্তত এই ব্যাপারে তাকে আর সুযোগ দেবে না বরকতী।

এইডকে দ্রুত কিছু নির্দেশ দিল মুরাদ। অন্য কোন মিলিটারি ইউনিটের সাথে যোগাযোগ না করার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে অফ করে দিল রেডিও। কিছু ভাবল, তারপর ফোন করল কাবুলের জেনারেল স্টাফ সার্ভিসের ইমার্জেন্সি নাম্বারে।

'কর্নেল মুরাদ বলছি, চীফ অভ স্পেশাল সিকিউরিটি ইউনিট, অ্যাটাচড্ টু তালেবান রেভলিউশনারি কাউন্সিল,' গম্ভীর গলায় বলল সে।

'ইয়েস, কর্নেল! স্যার?'

'আমার কাছে হাইলি ক্লাসিফায়েড ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট এসেছে। ওটায় বলা হয়েছে, একদল ইরানী ইনফিলট্রেটর দেশের দক্ষিণ সীমান্তের কোথাও ল্যান্ড করেছে। ওদের ধরতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কপ্টার সাপোর্টসহ এক কোম্পানি ক্র্যাক ট্রুপস চাই আমি।'

'কিন্তু এ অসম্ভব, স্যার!' রিসিভার বলে উঠল। 'আমাদের সমস্ত ইউনিট বর্ডারের দিকে যাচ্ছে। ওখান থেকে...'

'আপনি চান ইরানী স্যাবোটিয়াররা দেশের মধ্যে ঢুকে নাশকতামূলক কাজ করুক, আমাদের ক্ষতির বোঝা আরও ভারী করুক?'

'না, কর্নেল। আমি বলতে চাইছি আপনার দাবি পূরণ করা এ মুহূর্তে সম্ভব নয়।'

আরও গম্ভীর হলো মুরাদ। 'আপনি কি জানেন আমি এ ব্যাপারে স্বয়ং প্রেসিডেন্টের অনুমোদন নিয়ে তবে আপনাদের সাথে যোগাযোগ করেছি?'

বিষম দ্বিধায় পড়ে গেল লোকটা। 'না, কর্নেল, স্যার!'

'ওকে। প্রয়োজন মনে করলে তাঁর সাথে যোগাযোগ করে শিওর হয়ে নিয়ে নিন, তারপর যা বললাম, ইমিডিয়েটলি তাই করুন।'

জবাবের অপেক্ষায় না থেকে ফোন রেখে দিল কর্নেল। নিজের নাকেমুখে মিথ্যে বলায় পারঙ্গমতা দেখে মনে মনে হাসল। এতবড় এক মিথ্যে বলল, অথচ জেনারেল স্টাফের তা ধরার ক্ষমতা নেই,

ভাল করেই জানে সে। এমন জরুরী মুহূর্তে এই সমস্ত তুচ্ছ ব্যাপারে তাঁকে বিরক্ত করতে সাহসই হবে না ওদের।

ব্যাপারটা হঠাৎ করেই ঘটল। রানাসহ প্রায় সবার চোখ-মন, দুটোই ছিল গাড়ির দিকে, তাই খেয়ালই করেনি কখন একদল সশস্ত্র, পাহাড়ী আফগান এসে হাজির হয়েছে। ওর টনক নড়ল পকেটফোন মাইকে হেকমত আলির চাপা সতর্কবাণী শুনে। একটু তফাতে সরে তলপেটের চাপ খালাস করতে গিয়েছিল লোকটা।

'পিছনে দেখুন, বস্।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরল ও, অস্ত্রের দিকে হাত চলে গিয়েছিল আপনাআপনি, কিন্তু সামাল দিল এখনই তার দরকার নেই দেখে। গাধার পিঠে বসে আছে মানুষটা। কম করেও ছয় ফুট চার ইঞ্চি হবে, পাশেও তেমনি। মুখ বিরাট, প্রায় গোল। গাল ভর্তি দাড়ি। দেখতে আস্ত এক দানবের মত। তার ভার বইতে গিয়ে পিঠ বাঁকা হয়ে গেছে গাধাটার। দানবের কাঁধের ওপাশ থেকে মাথা তুলে আছে হেভি কালাশনিকভের নল। ওদের ওপর চোখ রেখে সিগারেট তৈরি করছে সে। খালি পা।

তার পিছনে আরও তিনটে গাধা, প্রতিটার পিঠে একজন করে সওয়ারী। দানবের মত তাদের পিঠেও কালাশনিকভ। এক এক করে প্রত্যেককে দেখল রানা। কারা এরা?

'দারুণ ওস্তাদ তোমরা, মাই ফ্রেন্ড!' গমগমে কণ্ঠে বলে উঠল প্রথমজন, শ্লেষ্মা জড়ানো গলায় হাসল খ্যাঁক্-খ্যাঁক্ করে। প্রকাণ্ড ভুঁড়ি আর মাটির বড় জোর এক ইঞ্চি ওপরে ঝুলন্ত দুই গদার মত পা দুলে উঠল তার। 'এতবড় ক্ষতি করে দিলে ওদের?' মাথা ঘুরিয়ে কন্টারের ধ্বংসস্তূপ আর মৃতদেহগুলো দেখাল। 'তা ভালই করেছ। কিন্তু...তোমরা কারা বলো দেখি! দেখে তো মনে হয়

আর্মি!'

'ভুল হয়নি আপনার,' রানা বলল। 'আমরা আর্মিই।'

প্রকাণ্ড মাথা ওপর-নিচে দোলাল সে, যেন বিশ্বাস করেছে নির্দ্বিধায়। 'আমরাও তাই ভাবছিলাম। কিন্তু আর্মি হয়ে আর্মির কপ্টার, ট্রুপার...ইয়ে, ঠিক বুঝলাম না ব্যাপারটা।'

'কমান্ডিং অফিসারের সাথে গণ্ডগোল হয়েছে আমাদের।'

'আহ্, আই সী, মাই ফ্রেন্ড!' সিগারেট ধরিয়ে টানল লোকটা, পরক্ষণে কেশে উঠল ভীষণভাবে। কাশির দমক দেখে রানার মনে হলো এবার নির্ঘাত বসে পড়বে তার গাধা। 'তার মানে তোমরা বিদ্রোহী?'

জবাব দিল না ও। সতর্ক চোখে লোকগুলোকে মাপছে, অস্ত্র তোলার প্রয়োজন পড়বে কি না বোঝার চেষ্টা করছে।

'ভাল, ভাল!' মাথা দোলাল লোকটা। 'তোমরা তাহলে আমাদের বন্ধুই।' ফের হা-হা করে হেসে উঠল। আগ্নেয়গিরির মত ভয়াবহ আওয়াজ উঠল, গোটা ল্যান্ডস্কেপ কাঁপিয়ে দিল। অস্বস্তি লেগে উঠল রানার।

'আপনারা...?'

'আমরা?' হাসি থামিয়ে আরেক দম দিল সে সিগারেটে। কাশল। 'এই...তোমাদের মতই বলতে পারো।'

'মুজাহেদিন?'

'হ্যাঁ।' একটু বিরতি দিয়ে আবার বলল, 'তোমরা এতগুলো শয়তানকে কচু-কাটা করেছ দেখে আমরা ভারি খুশি হয়েছি, মাই ফ্রেন্ড। সত্যি ভারি খুশি হয়েছি।'

'ধন্যবাদ।'

'না না, ধন্যবাদ দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। ওটা বরং তোমাদেরই প্রাপ্য।'

দেহের ভর এক পা থেকে অন্য পায়ে চাপাল মাসুদ রানা। 'এই অসময়ে কি করছেন আপনারা এখানে?'

সিগারেটের গোড়ার দিকের খানিকটা লূজ তামাক দাঁত দিয়ে কেটে 'থোক্' করে ফেলল দানব, ঠিক রানার একহাত সামনে। 'তুমি বেশি প্রশ্ন করো, স্ট্রেঞ্জার।' ফের কষে ধোঁয়া টানতে গিয়ে কেশে উঠল।

'দুই স্ট্রেঞ্জার যদি পরস্পরকে প্রশ্ন না করে, তাহলে একজন অন্যজন সম্পর্কে জানবে কি করে!' এমনভাবে বলল ও, প্রশ্ন হলেও শোনাল মন্তব্যের মত।

মনে মনে ওর যুক্তি স্বীকার করে নিলেও প্রকাশ করল না লোকটা, স্থির হয়ে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। বাতাসে হাই ভোল্টেজ কারেন্টের মত টেনশন বিরাজ করল কিছু সময়ের জন্যে। মেঘ সরে যেতে চাঁদ বের হলো। তার নিস্তেজ, ঠাণ্ডা আলোয় দু'চোখ চকচক করে উঠল পাঠানের। তিন সঙ্গী নড়েচড়ে বসল বাহনের পিঠে।

তারপর হঠাৎ করে দানবের ঘন দাড়ির মধ্যে একটা ফাঁক দেখা দিল। হাসছে। 'ভাগ্যগুণে আজ এক বুদ্ধিমান মানুষের সাথে পরিচয় হয়ে গেল বলে আমি খুশি হয়েছি।' বাঁ পা গাধার মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে মাটিতে রেখে দাঁড়াল লোকটা।

ডান হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমি সালামতউল্লাহ্।'

নিজের হাতের দ্বিগুণ বড়, থাবার মত হাতটা ঝাঁকিয়ে দিল ও, নাম ঘোষণা করার প্রয়োজন মনে করল না।

ওর দিকে তাকিয়ে আরেকবার দাঁত দেখাল সালামত। 'এবার আমি কিছু প্রশ্ন করি, কেমন? তোমরা কাদের সমর্থক, আমাদের, না তালিবানদের?'

'কারও না। আমরা স্বাধীন।'

'ও হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কি এমন ঘটল...'

'কমান্ডিং অফিসারের সাথে মতের মিল হচ্ছিল না অনেকদিন থেকে, তাই সরে পড়ব ঠিক করেছিলাম। আজ সুযোগ এসে গেল।'

মাথা দোলাল সালামতউল্লাহ। 'ভালই করেছ, মাই ফ্রেন্ড। এবং সঠিক জায়গাতেই এসেছ। এখানে আমাদের মধ্যে থেকে যত খুশি স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে তোমরা। আমরাও তোমাদের চমৎকার গাড়ি দুটো কাজে লাগাতে পারব।'

প্যান্থার ওয়ানের দিকে এগিয়ে গেল সে। চোখ কুঁচকে ওটার ভেতরে-বাইরে দেখল। 'অস্বাভাবিক,' মাথা দোলাল আপনমনে। 'খুবই অস্বাভাবিক জীপ তোমাদের, সোলজার বয়। এমন গাড়ি আগে কখনও দেখিনি আমি। ভেরি ইমপ্রেসিভ। ডেঞ্জারাস!' শেষ উপমাটা পছন্দ হওয়ায় মাথা দোলাল। 'রিয়েলি ডেঞ্জারাস।'

সদরউদ্দিন ছাড়া থান্ডারবোল্ডের অন্য সদস্যরা কাজে ব্যস্ত, এদিকে বিশেষ নজর নেই কারও। করপোরালের সতর্ক চোখ পড়ে আছে সালামতউল্লাহ ও তার তিন সঙ্গীর ওপর। ওদের সবাইকে দেখল লোকটা, তারপর চেহারা বিকৃত করে হাসির ভঙ্গি করল।

'তোমার সঙ্গীরা,' গাল চুলকাল। 'মূক ও বধির রেজিমেন্টের সদস্য নাকি, মাই ফ্রেন্ড?' সদরউদ্দিনকে উদ্দেশ করে প্রশ্নটা করল সে।

'ওরা কাজে ব্যস্ত দেখতেই পাচ্ছেন,' জবাবটা রানা দিল, এবং খুব দ্রুত। কারণ ও ছাড়া দলে ভাল পশতু জানত একমাত্র সার্জেন্ট শহীদ। এরা যা জানে, তা কোনরকমে ঠেকা চালানোর জন্যে শেখা। মুখ খুললে কে কোন ভুল করে বসে, তাই কাটাবার চেষ্টা করল।

কিন্তু কাজ হলো না। পরের প্রশ্নটা আবারও সদরউদ্দিনকে করল সে। 'আমরা তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারি?'

মুখ খোলার আগে চট্ করে রানাকে দেখে নিল সে একপলক। বলতে চাইল 'কোন দরকার নেই, ধন্যবাদ,' কিন্তু ভুলে বলে বসল, 'আমরা ভাল আছি, ধন্যবাদ।'

গাল কোঁচকাল রানা। আহাম্মকটা কেন মুখ খুলতে গেল? না হয় না শোনার ভানই করত। সালামতউল্লাহর ভুরু কুঁচকে উঠল দেখে শান্ত গলায় রানা বলল, 'সরি। ও কানে ভাল শোনে না। বুঝতে ভুল করেছে।'

মাথা দোলাল লোকটা। 'আজকাল এইসব অচল মালও চলে তাহলে আফগান সেনাবাহিনীতে!'

ট্রান্সপোর্ট হেলিকপ্টার ধ্বংস হলেও বেশি আনন্দিত হওয়ার কিছু নেই, জানে রানা। ডিটাচমেন্টের সবাই মারা গেছে বলে মানতে রাজি নয়। কিছু নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। ধারেকাছেই হয়তো ওত পেতে আছে রিইনফোর্সমেন্টের আশায়, ওরা এসে পৌঁছলেই ফের শুরু করে দেবে। কাজেই তাড়াতাড়ি গাড়ি মেরামত করে ভাগতে হবে।

উটকো সালামতউল্লাহ এসে দেরি করিয়ে দিয়েছে ঠিকই, তবে তাকে মনে মনে স্বাগতও জানাল রানা গাধাগুলো কাজে লাগানো যাবে ভেবে। প্যান্থার ওয়ানের একটা টায়ার গেছে, তবে ওপরের নিরাপদ জায়গাতে আছে ওটা। সমস্যা হয়েছে টু-কে নিয়ে। একদিকের দুটো টায়ার তো গেছেই, তারওপর ট্র্যাকের কিনারায় এমনভাবে হেলে আছে ওটা যে ওদের পক্ষে ঠেলে ওপরে তোলা ভীষণ কঠিন। গাধার সাহায্যে ওটাকে তোলার আয়োজনে লেগে পড়ল আলালউদ্দিন ও জাহাঙ্গীর।

ওদিকে সালামতউল্লাহ সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েও বলতে গেলে কিছুই করল না হুকুমদারী ছাড়া। বড় এক বোল্ডারে বসে সিগারেট

টানা আর খানিক পরপর বিচ্ছিরি কাশির সাথে সঙ্গীদের উল্টোপাল্টা নির্দেশ দিয়ে সহজ কাজ বরং জটিল করে তুলল সে। দলের সবচেয়ে হীনস্বাস্থ্যের লোকটিই যা একটু ঘাম ঝরাল ওদের জন্যে। বাকি দু'জন যা করল, তা শুধু দেখানোর জন্যে। টানা বিশ মিনিট পরিশ্রম করে টু-কে ওপরের খোলা জায়গায় নিয়ে আসা হলো।

সঙ্গে সঙ্গে ফর্মুলা ওয়ান পিট স্টপ ক্রুদের মত তুফান বেগে টায়ার বদলের কাজে লেগে পড়ল ওরা।

ওদিকের কাজ শুরু হতে আর কোথায় কি ক্ষতি হয়েছে চেক্ করতে লেগে পড়ল রানা ও সদরউদ্দিন। চারদিক একদম নীরব, মৃদু বাতাস ছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই। চাঁদ পশ্চিম আকাশে হলুদ আভা ছড়িয়ে ডুবে যাচ্ছে এখন। ভোর হতে আর দেরি নেই।

ক্ষয়ক্ষতির হিসেব দ্রুত সেরে নিল ওরা। প্যান্থার ওয়ানের একটা চাকা ছাড়া লং রেঞ্জ স্কাইওয়েভ সেটও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর গেছে হেডল্যাম্পের কিছু বালব্। কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট নিয়ে চিন্তার কিছু নেই, কারণ ওটার ডুপ্লিকেট আছে রানারটায়। টায়ার আর বালব্ বদলে নিলেই হবে।

আসল চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল টায়ারের স্টক। প্রতিটার সাথে দুটো করে এক্সট্রা ছিল, এক ধাক্কায় তিনটেই গেছে। আর একটা মাত্র বাকি থাকল। যদি এরকম আরেকটা অ্যামবুশে পড়তে হয়, তাহলে হয়তো একটা গাড়ির মায়া অন্তত ছাড়তে হবে। আরেকটা বড় ক্ষতি হয়েছে প্যান্থার টুর বিশেষ ওয়াটার জ্যাকেট ফুটো হয়ে। রেডিয়েটরের সামনে ফিট্ করা ছিল পানি ভরা জিনিসটা, রেফ্রিজারেশন ইফেক্টের মাধ্যমে রেডিয়েটরের পানির গরম হয়ে ওঠা ঠেকানোর কাজ করত। ওটা ছাড়া দিনের বেলা

মরুভূমিতে ছুটতে গেলে মাত্রাছাড়া গরম হয়ে উঠবে পানি, কিছু করার থাকবে না।

কোনমতে সামাল দেয়া হলো অবশ্য ফুটোগুলোকে, কিন্তু ততক্ষণে যে পরিমাণ পানি পড়ে গেছে, তা পূরণ করতে গিয়ে দলের খাবার পানির রিজার্ভ আশঙ্কাজনক মাত্রায় নেমে গেল।

চার

'তোমাদের দলে মেয়েও আছে দেখছি, মাই ফ্রেন্ড!'

সালামতউল্লাহর বিস্মিত প্রশ্নে সচকিত হলো মাসুদ রানা। আর সবার মত যূথীও ফেটিগ পরে আছে, তারওপর আলোও অপর্যাপ্ত, তাই ব্যাপারটা ওদের চোখে পড়বে না ধরে নিয়েছিল ও, এরা না যাওয়া পর্যন্ত ওর সাথে সবাইকে পুরুষ সঙ্গীর মত আচরণ করতে বলে ভেবেছে তাতেই কাজ হবে। কিন্তু হলো না। নিজেকে পুরুষ প্রমাণ করার জন্যে সমানতালে কাজ করতে গিয়েই ধরা পড়ে গেছে মেয়েটা। ঝুঁকে বসে হেকমত আলির সাথে টায়ার মেরামত করার ফাঁকে খেয়ালই করেনি ওপরের বোতাম খোলা থাকায় বুক দেখা যাচ্ছে তার।

রানা মুখ খোলার আগেই লোকটা আবার বলে উঠল, 'আমিও একসময় আর্মিতে ছিলাম। কিন্তু তখন মেয়ে ছিল না। সময় সত্যি বদলে গেছে। যদি জানতাম আর্মিতে আজকাল মেয়ে নেয়া হয়,

তাহলে হয়তো আবার যোগ দিতাম।'

হা-হা করে হেসে উঠল সে। তারপর হঠাৎ করেই চাউনি কঠোর হয়ে উঠল। 'কিন্তু তালিবানদের হঠাৎ এই মতিভ্রম কেন হলো বলো তো, ফ্রেন্ড? মেয়েদের বেলায় এই সরকারই সবচেয়ে কঠোর, অথচ তারাই...তারওপর তোমাদের এই টিউনিকও আগে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ওগুলো ডেজার্ট ব্যাটেল টিউনিক।'

'হ্যাঁ, ঠিক,' মাথা দোলাল রানা। 'আমাদের এটা স্পেশাল ইউনিট,' বলল বটে, তবে লোকটাকে যে বিশ্বাস করাতে পারেনি, তা-ও বুঝল। 'গাড়ির উইঙে ওই ইনসিগনিয়া, ওগুলো হচ্ছে...'

মাথা দুলিয়ে বাধা দিল সালামতউল্লাহ। 'বুঝেছি। কিন্তু, ফ্রেন্ড, আমার বাহুতেও ঈগলের টাট্টু আঁকা আছে। কিন্তু তাতে আমি আমেরিকান হয়ে যাইনি। এ ধরনের ট্রিক্ ইরানী ইনফিলট্রেটররাও ঘটাতে পারে।'

রেগে উঠল রানা। অন্যরাও কাজ থামিয়ে এদিকে তাকিয়ে থাকল। লোকটার কথার ধরণ যে বদলে গেছে, সবাই বুঝে ফেলেছে।

'মন্তব্যটা করে নিজেকে তুমি আস্ত এক আহাম্মক প্রমাণ করলে, সালামতউল্লাহ!' বলল রানা। 'একজন রেগুলার সৈনিককে এত ছোট করে দেখা উচিত হয়নি তোমার।'

মুহূর্তের জন্যে মনে হলো ধোঁকায় কাজ হয়েছে। বিশ্বাস করেছে সে। কিন্তু না, বসে থেকেই চোখের পলকে রানার বুকে কালাশনিকভের নল ঠেকিয়ে ধরল লোকটা। 'ওসব বুঝি না। এখন থেকে আমাদের সাথে থাকবে তোমরা, আমাদের হয়ে লড়াই করবে। নইলে গাড়ি আর মেয়েটার আশা বাদ দিতে হবে।'

আড়চোখে দেখল রানা, কাজ থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে

লোকটার তিন সঙ্গী। উঠে পড়েছে, এক পা-দু'পা করে সালামতউল্লাহর দিকে এগোচ্ছে। একই সাথে, 'ও কিছু নয়' গোছের ভাব করে ধীরেসুস্থে নিজেদের অস্ত্র নামাচ্ছে কাঁধ থেকে। হাসি জমাট বেঁধে আছে ঠোঁটে।

নিয়ম এক, ভাবল মাসুদ রানা, অস্ত্র ধরার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে কখনও শত্রুর হাতের নাগালের মধ্যে দাঁড়াবে না। সালামতউল্লাহকে তা এবার শিখিয়ে দেয়া উচিত। বাঁ হাতের এক ধাক্কায় কালাশনিকভের নল সরিয়ে দিল ও, পরমুহূর্তে ডান হাত চালাল বিদ্যুৎগতিতে। দানবের নাক-মুখ সই করে মারল প্রচণ্ড ঘুসিটা। এক ডিগবাজি খেয়ে বোল্ডারের ওপাশে গিয়ে পড়ল সে, অন্তিম চাঁদের আলোয় একবার ঝিকিয়ে উঠে উড়ে গেল রাইফেল।

কিন্তু আশ্চর্য, এক মুহূর্ত পরই সবাইকে অবাক করে দিয়ে তড়াক করে উঠে পড়ল সালামতউল্লাহ, শীপস্কিন কোটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে পিস্তল নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া শুরু করল। এই সময় আলালউদ্দিনের হাতের পাম্প অ্যাকশন শটগান গর্জে উঠল সবার পিলে চমকে দিয়ে। সালামতউল্লাহর দুই সঙ্গী অস্ত্র তুলেছিল রানাকে সই করে, পেন্সিল স্কেচের ওপর জোরে ইরেজার ঘষলে যেমন মুহূর্তে তা মুছে যায়, ল্যান্ডস্কেপ থেকে ঠিক তেমনি মুছে গেল লোক দুটো। পড়ে গেল হুড়মুড় করে।

ওদের পিঠ মাটি ছুঁয়েছে কি ছোঁয়নি, এমন সময় মৃদু দুপ! দুপ! করে উঠল রানার ওয়ালথার পিপিকে। পিস্তল বের করে এনেছিল সালামত, তুলতে যাচ্ছিল, বুকে আর গলায় গুলি খেয়ে দুই দফায় তিন-চার হাত পিছিয়ে গেল। চোখ কপালে তুলে উল্টে পড়ে গেল ধপাস্ করে।

শেষ লোকটা কয়েক মুহূর্ত পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর কালাশনিকভ ফেলে ঘুরেই দে দৌড়। তিন পা যাওয়ার

আগেই আবার গুলি করল আলালউদ্দিন। সুতোয় বাঁধা পুতুলের মত পায়ে টান খেয়ে আছড়ে পড়ল সে।

হঠাৎ করে গভীর নিস্তব্ধতা চেপে বসল পরিবেশে।

'পিছন থেকে ওকে মারার কি দরকার ছিল?' অনেকক্ষণ পর শেষ লোকটিকে দেখিয়ে বলল সাংবাদিক। 'ও তো পালিয়েই যাচ্ছিল।'

'সেই জন্যেই তো পিঠে গুলি করা হয়েছে,' সদরউদ্দিন বলল জবাবে। 'নইলে বুকে করা হত।'

আরও পরিষ্কার ব্যাখ্যার জন্যে রানার দিকে ফিরল লোকটা। প্রশ্ন মুখে করল না, করল চোখ দিয়ে।

শ্রাগ করল ও। 'ওরা ফ্রেন্ডলি থাকলে এসবের দরকার পড়ত না। ওরাই আমাদের এ কাজে বাধ্য করেছে। আর পিছনে শত্রুকে জ্যান্ত রেখে যাওয়া আমাদের মিশনের জন্যে বিপজ্জনক হতে পারত। কাজেই···।'

আরও আধ ঘণ্টা পর গড়াতে শুরু করল দুই ল্যান্ড রোভার। দেরি পুষিয়ে নিতে এবং আলো ফোটার আগে নতুন আশ্রয় খুঁজে বের করতে হবে বলে ঝড়ের গতিতে ছোটাল ফয়েজ ও হেকমত। ভালই এগোল দল। রেঞ্জের এই অংশের মাটি অন্য সব জায়গার তুলনায় যথেষ্ট সমতল, কাজেই উপত্যকার পর উপত্যকা অতিক্রম করে অল্প সময়ের মধ্যে লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে এল ওরা।

ভোরের প্রথম আলোর আভাস যখন ফুটল, রণক্ষেত্র ছেড়ে দক্ষিণে পঁয়তাল্লিশ মাইল সরে এসেছে ওরা। জালালাবাদ শহর বিশ মাইল ডানে রেখে ছুটছে। একেবারে বিরান এলাকা এটা, যতদূর চোখ যায় পাথুরে মাটি আর পাহাড় ছাড়া কিছুই নেই। ফসলের মাঠ দূরের কথা, সবজি খেতও নেই। শুধু হালকা বাদামী রঙের মাটি।

রানার ধারণা এই একটি জায়গায় দিনের বেলা খালি চোখেই ওদের দেখতে পাবে যে কেউ। কারণ মাটি আর পাহাড়ের রঙের সাথে ওদের গাড়ির ক্যামোফ্লেজ রঙের বড় এক তফাত আছে। অল্প হলেও প্যান্থারে পিঙ্ক শেড আছে, ওই রঙের জন্যে খুব সহজেই আলাদা করে চেনা যাবে ওগুলোকে।

হিন্দুকুশ রেঞ্জ ছেড়ে এসেছে ওরা, সামনে খাইবার পাস, এইজন্যে রঙের এই হেরফের। যাত্রাবিরতির সময় হয়েছে। দিনটা এখানে কোথাও কাটিয়ে কাল রাতের মধ্যে শর্টকাট পথে মারুফ পৌঁছতে হবে। কিন্তু হেকমত আলি আকারে যাই হোক, দুর্দান্ত সাহসী মানুষ। থামার আগে আরও প্রায় চল্লিশ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে গুমাল নদীর উপত্যকায় থামল সে। ঘন বনের ভেতরে ঢুকে দিন কাটাবার প্রস্তুতি নিতে শুরু করল টীম।

দৌলত ইয়ার পর্যন্ত পথে বেশ কয়েকটা রোডব্লকে দাঁড়াল বাস, সমস্ত যাত্রী নামিয়ে ভেতরের মালপত্র, গাট্টি-বোঁচকা, সব তন্ন তন্ন করে সার্চ করল পুলিস আর আর্মি। ব্যাপার কি প্রথমে বুঝতে না পেরে বেশ অস্বস্তিতে পড়েছিল সার্জেন্ট শহীদ, একটু ভয় ভয়ও লাগছিল।

পরে কারণ জানা গেল। সীমান্তের ওপারে ইরান সৈন্য জড়ো করেছে, অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র, ট্যাঙ্ক-প্লেন ইত্যাদি সামরিক মহড়া দিচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালাতে পারে ওরা। ইরানী ফিফথ্ কলাম ঢুকে পড়েছে বলে গুজব রটেছে, স্যাবোটাজ ঘটাতে চেষ্টা করবে ওরা, তাই জনগণের জানমালের হেফাজতের জন্যে...ইত্যাদি।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সার্জেন্ট। মাইমানা থেকে খুব ভোরে ছেড়েছে ওদের বাস। ওখানে রাত কাটানো নিয়ে বড় সমস্যায়

পড়ে গিয়েছিল। পরে সাহস করে এক বাড়িতে আশ্রয় নিতে হলো। মুসাফির জেনে সাদরেই থাকতে দিয়েছে ওরা। শুধু কোত্থেকে এসেছে ওরা, কোথায় যাবে, এইটুকুই জানতে চেয়েছে, আর কোন বেয়াড়া প্রশ্ন করেনি।

কাছের এক গ্রামে ওদের বাড়ি, হামিদা গর্ভবতী, পেটের ব্যথায় অস্থির হয়ে স্বামীর সাথে শহরের হাসপাতালে ভর্তি হতে এসেছে, কিন্তু পৌঁছতে দেরি হয়ে গেছে বলে আজ ভর্তি হতে পারেনি, কাল হবে, এইসব বলে পার পেয়েছে। এরমধ্যে অবিশ্বাস করার কিছু নেই, এমনটা হতেই পারে। তাই এ নিয়ে কোন কথা তোলেনি ও বাড়ির কেউ। আগের রাতটাও এই কথা বলেই বেলচিরাগের কাছে এক গ্রামে রাত কাটিয়েছে ওরা।

পর পর দু'রাত স্বামী-স্ত্রীর মত একসঙ্গে, একই বিছানায় ঘুমিয়েছে দু'জনে, অথচ ওর মত এত সুন্দরী যুবতী নাগালের মধ্যে থাকতেও সার্জেন্ট হাত বাড়ায়নি, ভাবতে বেশ আশ্চর্যই লাগছে হামিদার। মানুষটার প্রতি শ্রদ্ধা যেমন জমেছে তার মনে, তেমনি ভক্তিও।

একটু পর বাস ছাড়ল। কুশক হয়ে হিরাত যাবে ওটা, ওখান থেকে দৌলতাবাদ হয়ে কান্দাহার যাবে শহীদ ও হামিদা। পথে অন্য কোন সমস্যা যদি না ঘটে, আশা করা যায় দু'দিন পর...

বন্ধ চোখের পাতা কুঁচকে উঠল মাসুদ রানার। একটা ছায়া পড়েছে। আগেও কয়েকবার পড়েছে। ওটা হেকমত আলি। লোকটা কেন যেন ঘুরঘুর করছে ওর সামনে দিয়ে। মনে হয় কিছু বলতে চায়, অথচ বলছে না। রানা চোখ মেললেই অপ্রস্তুত হয়ে সরে পড়ে। এবার সে সুযোগ দিল না ও, ডেকে বসল, 'হেকমত আলি!'

'জ্বি?'

'কিছু বলবে?'

'জ্বি, মাসুদ ভাই। মানে, ইয়ে...বস্!'

'বলে ফেলো, কি?'

দ্বিধার সাথে ওর দিকে দু'পা এগোল মানুষটা, আড়চোখে দলের অন্যদের দেখে নিল। তিন ভাগ হয়ে বসে আছে সবাই, গল্প করছে, নয়তো ঝিমাচ্ছে। এক দলে আছে থান্ডারবোল্টের চারজন, অন্য দলে সাংবাদিক যুগল। এদিকে রানা একা। গাছের ছায়ায় একটু দূরে দূরে বসে আছে ওরা। বাকি দুই কমান্ডো ওয়াচের দায়িত্বে আছে।

'না, মানে, আজ রাতের ট্রান্সমিশনের ব্যাপারে বলছিলাম,' নিচু গলায় বলল ট্রুপার। 'ওর সাথে যদি আমার...'

'তোমার কি?'

চেহারায় কিছুটা লালের আভাস ফুটল তার। 'মানে...ওর সাথে একটা ব্যক্তিগত মেসেজ পাঠানো যায় কি না, তাই ভাবছিলাম।'

গাছের সাথে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে ছিল রানা, উঠে বসল। কপাল কুঁচকে আছে। 'কি সেটা?'

চোখ-কান বুজে হড়বড় করে বলে গেল হেকমত আলি, তারপর প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল আড়ষ্ট হয়ে। চেহারা দেখে ভয় হলো এই বুঝি দাবড়ি লাগিয়ে বসল লোকটা। কিন্তু না, তেমন কিছুই করল না রানা। বরং হাসল মিটিমিটি।

'আশ্চর্য! তোমার গিন্নির বাচ্চা হবে, এমন একটা সুখবর এত দেরিতে দিচ্ছ! কালকেই বলতে পারতে!'

বোকা হয়ে গেল ট্রুপার, আর যাই হোক, এই প্রতিক্রিয়া আশা

করেনি সে মাসুদ রানার কাছ থেকে। ধমক না হোক, অন্তত ওর আবেদন যে মেজর কানে তুলবে না, সে ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত ছিল। অথচ ঘটল কি না উল্টো!

'না, বস্, মানে...'

'ঠিক আছে, আর মানে মানে করতে হবে না।'

বুদ্ধিটা সার্জেন্ট শহীদের মাথায় হঠাৎ করেই গজাল। চলন্ত বাসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বেশ কিছু সময় ভাবল সে ওটা নিয়ে, তারপর সন্তুষ্ট মনে মাথা ঝাঁকাল–চলবে। সুযোগ মত হামিদাকে খুলে বলল সব। হাঁ হয়ে গেল মেয়েটা। 'কি বলছেন?' চোখ বড় বড় করে তাকাল।

'এ ছাড়া তাড়াতাড়ি ওখানে পৌঁছার কোন উপায় দেখছি না, হামিদা। কাজটা করতেই হবে যেভাবে হোক।'

'কিন্তু তাই বলে ভলান্টিয়ার ব্যাটল পার্টি! ইরানের সঙ্গে লড়াই করার কথা বলে দল তৈরি করবেন! পাগল হয়েছেন আপনি?'

অদ্ভুত হাসি ফুটল সার্জেন্টের নকল দাড়ি ভর্তি মুখে। 'না, হইনি। হওয়ার কোন কারণও নেই,' ইঙ্গিতে ওর ফোলা তলপেট দেখাল। 'আমার ব্যাগে এ দেশী ব্যাটল ড্রেস আছে, দুটো ইনগ্রাম আছে। একটু আড়াল পেলেই তৈরি হয়ে নিতে পারব আমি, তারপর মানুষ জড়ো করতে খুব একটা বেগ পেতে হবে না।'

'কিন্তু ওরা প্রশ্ন করবে, আমাদের পরিচয় জেনে যাবে। তখন?'

'কিছুই করবে না ওরা,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল সে। 'আপনি শুধু আমার নির্দেশ মেনে চলবেন, বাকি সব আমি ম্যানেজ করব।'

রাজ্যের অবিশ্বাস ভরা চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল হামিদা, মাথা নাড়ছে। এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না ও

যা বলছে তা সত্যি, নাকি ঠাট্টা।

'সময়মত ওখানে পৌঁছতে হলে এ ছাড়া উপায় নেই আমাদের, হামিদা। রোডব্লকে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, শেষে কুলিয়ে ওঠা যাবে না।'

ততক্ষণে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে শহীদ, প্ল্যান সফল হলে সোজা নওযাদ চলে যাবে। ওখান থেকে কান্দাহার, তারপর রেজিস্তানের মরুভূমি পাড়ি দিয়ে লান্ডি মোহাম্মদ আমিন খান হয়ে সোজা পাকিস্তানের চাগাল পর্বতমালায়। পরের রোডব্লকে সার্জেন্টের হাসি দুই কানে গিয়ে ঠেকল। তার পরিকল্পনা যে সফল হতে চলেছে, সে ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ রইল না। হামিদাও টের পেল তা।

রাস্তার পাশের বড় এক মাঠে সমাবেশ চলছে ওখানে। লাউডস্পীকারে কেউ একজন চ্যাঁচাচ্ছে, 'ঈমানদার মুসলমান জাগো! সাচ্চা মুসলমান জাগো! অত্যাচারী ইরানী শিয়া গোষ্ঠীর আগ্রাসী হাত গুঁড়িয়ে দাও। ওরা শয়তান, ইসলামের নামে ধোঁকাবাজি করে। ওদের ছেড়ে দেয়া যায় না। কোন সাচ্চা মুসলমান ওদের এই অন্যায় মেনে নিতে পারে না!'

মুখ টিপে হাসল শহীদ। 'কেমন বুঝছেন?'

হামিদা জবাব দিল না, তবে চাদরের নিচে ওর চোখ যে হাসছে, তা বোঝা গেল।

'শয়তানের দল সাচ্চা আফগানদের উত্থান ভাল চোখে দেখছে না, তাই এ দেশের ওপর আগ্রাসনের পাঁয়তারা করছে। এ সময় দেশপ্রেমিক নাগরিকদের ঘরে বসে থাকার উপায় নেই। সবাই জাগো, এক হও। সব গাড়ি, বাস-লরি যা আছে জড়ো করো, যার যা অস্ত্র আছে, তাই নিয়ে উঠে পড়ো। ফ্রন্টে চলো! শয়তানের বিষদাঁত ভেঙে দিতে হবে! ওয়াতানকে রক্ষা করতে হবে!'

জনতার আকাশ ফাটানো চিৎকারে কানে তালা লেগে গেল ওদের।

'চলে এসো! সক্ষম সবাই উঠে পড়ো, তোমরা সবাই এখন দেশরক্ষা বাহিনীর সদস্য!' নীল ব্যাটল ড্রেস পরা এক দীর্ঘদেহী আফগান সার্জেন্ট চ্যাঁচাচ্ছে। কাঁধে ইনগ্রাম। তার সঙ্গে এক মেয়ে স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধাও আছে।

জাম পাহাড়ের হতচ্ছাড়া এক গ্রামের বাজার। চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক লরির ওপর থেকে চ্যাঁচাচ্ছে লোকটা। ফলের চালান পৌঁছে দিতে এসেছিল ওটা, সরকারের নামে, দেশের নামে মুখে মুখে 'রিকুইজিশন' করে ফেলেছে সার্জেন্ট।

তার হাঁকডাকে এরমধ্যেই ছোটখাট ভিড় জমে গেছে, জনতা অবাক চোখে তাকে দেখছে। কেউ জানে না কোত্থেকে এসেছে ওরা দু'জন। চায়ের দোকান মালিক বা লরি চালক, তারাও না। গাড়ি বেহাত হয়ে গেছে বুঝতে পেরে টেইলবোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে আছে চালক, সার্জেন্টের নকল দাড়ির নাচন দেখছে অসহায়ের মত।

'সবাই লাইন দিয়ে দাঁড়াও!' হাঁক ছাড়ল সে। 'কেউ ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করবে না। আর্মিতে ডিসিপ্লিন মেনে চলা একান্ত জরুরী।'

দেখতে দেখতে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন যুবক-মাঝবয়সী লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের কয়েকজনকে 'আনফিট' বলে বাতিল করে দিল সার্জেন্ট। ঘোষণা দিল যদি মা-বোনেরা কেউ লড়তে চায়, দলে নাম লেখাতে পারে। এল না কেউ, বরং 'ফিট'দের মা-বোনেরা কান্নাকাটি শুরু করে দিল দূরে দাঁড়িয়ে।

দুই ঘণ্টার মধ্যে ত্রিশজন বাছাই করা যোদ্ধা হুড়োহুড়ি করে

বেঁধে আনা গাট্টি আর বন্দুকসহ উঠে পড়ল লরির পিছনে। টেইলবোর্ড লাগিয়ে দেয়া হলো। সঙ্গিনীসহ ক্যাবে উঠে স্টার্ট দিল সার্জেন্ট, একরাশ ধুলো উড়িয়ে চলে গেল ওটা অজ্ঞাত 'রিক্রুটিং সেন্টারের' উদ্দেশে।

অজ্ঞাত, কারণ ওটা যে কোথায়, কেউই তা লোকটাকে জিজ্ঞেস করেনি। আসলে তার ভাবভঙ্গি আর কর্তৃত্বপূর্ণ আচরণ দেখে সে সাহসই কারও হয়নি।

রাত এগারোটায় শুরু হলো থান্ডারবোল্টের যাত্রা। গতরাতের দেরি পুষিয়ে নিতে হবে আজ। মরিয়া হয়ে ছুটতে হবে, নইলে দ্বিতীয় এস্কেপ প্ল্যানও বরবাদ হয়ে যাবে।

পাহাড়-মরুভূমি পেরিয়ে তুমুল গতিতে ছুটে চলেছে দুই পিঙ্ক প্যান্থার, দু'পাশের ল্যান্ডস্কেপও একই গতিতে পিছনে সরে যাচ্ছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল কোন বাধা বিঘ্ন ছাড়া, তাতে বরং রানার টেনশন আরও বাড়ল। প্রতিটা নার্ভ ছিলার মত টান্‌টান্ হয়ে থাকল ওর। অন্যদেরও একই অবস্থা।

হাইওয়ে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলছে ওরা। শুধু এড়িয়ে নয়, যত দূর দিয়ে সম্ভব ওগুলোকে পাশ কাটানো যায়, সেই চেষ্টা করছে। কারণ হাইওয়ে সব ব্যস্ত আজ, যেখানে যত আর্মি ইউনিট আছে, সবখান থেকে কিছু কিছু করে ইরান বর্ডারের দিকে যাচ্ছে। প্রচুর ট্রাক-লরি চোখে পড়েছে ওদের।

কিন্তু এত সতর্কতার পরও বিপরীতমুখী এক আর্মি বোঝাই ট্রাকের সামনে পড়ে গেল প্যান্থার টু। এড়িয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না। একেবারেই যে ছিল না তা নয়, ছিল, তবে তাতে পুরো দশ মিনিট নষ্ট হয়, ওরা সরে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, তাই ঝুঁকি নিয়ে ওটার মুখোমুখি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল মাসুদ রানা।

ট্রাক অতিক্রম করার সময় হর্ন বাজিয়ে, হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানাল। ট্রুপাররাও মাথার ওপর অস্ত্র দুলিয়ে নাচল খানিক।

দু'বার বিচ্ছিন্ন দুই পেট্রল পাম্পে থামল ওরা বাড়তি জ্বালানি স্টক করার জন্যে, কিন্তু কাজ হলো না। বন্ধ ওগুলো, নোটিস ঝুলছে, 'তেল নেই'। হতাশ হলো না রানা, তেল সঙ্গে যা আছে, তাতে এখনও বহুদূর যাওয়া যাবে।

ভোর পর্যন্ত একটানা ছুটে পাকিস্তানের ফোর্ট স্যান্ডেলম্যান বরাবর এপারের ছোট শহর মারুফের কাছে থামল ওরা। শহরের দশ মাইল উত্তর-পশ্চিমের হাই গ্রাউন্ডে আশ্রয় নিল। ততক্ষণে তেলের মজুত তলানিতে ঠেকেছে প্রায়।

বিনকিউলারে ভোরের হালকা কুয়াশার মধ্যে শহরটার ওপর নজর বোলাল রানা। বোঝা গেল মারুফ ন্যাশনাল গ্রিডের অধীনে। এয়ারপোর্ট আছে, ওয়াটার পাম্পিং স্টেশনও আছে দুটো। তার মানে তেলের ডিপোও থাকা উচিত। কিন্তু খুঁজে পেল না ও, হয়তো কোন উঁচু বিল্ডিঙের আড়ালে আছে বলে দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে।

পাশে দাঁড়ানো সদরউদ্দিনের দিকে ফিরল ও। 'পেট্রল দরকার আমাদের, করপোরাল। ওখানে মজুদ আছে। আজ তুমি সারাদিন নজর রাখবে শহরের ওপর, প্রয়োজন মনে করলে দুই-একজনকে শহরে পাঠাতেও পারো। ওরা কাছে থেকে পরিস্থিতি দেখে আসবে। অয়েল ট্রান্সপোর্ট মুভমেন্টের ডিটেইলড রিপোর্ট চাই আমি। তুমি মুভমেন্ট নোট করবে। রাতে ফুয়েল না হলে চলবে না আমাদের।'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'কিন্তু, বস্, আজ যেভাবে বাধাহীন আসতে পেরেছি, তাতে মনে হয় ওরা আমাদের হারিয়ে ফেলেছে। শহরে গেলে কেউ যদি চিনে ফেলে, নতুন করে ফ্যাসাদে পড়ে

যাব না?'

'এ দেশ ছেড়ে যতক্ষণ বের হতে না পারছি, ফ্যাসাদ ততক্ষণ আমাদের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ছাড়তে থাকবে,' শান্ত গলায় বলল ও। 'আর এ ছাড়া আমাদের আর কোন উপায়ও নেই। নাকি আছে?'

শ্রাগ করল সদরউদ্দিন। 'না, বস্।'

সকাল দশটায় প্রথম রিপোর্ট করল করপোরাল। এ পর্যন্ত মোট পাঁচটা অয়েল ট্যাঙ্কার পশ্চিমে যেতে দেখেছে সে, গড়ে ঘণ্টায় একটা করে। খুব সম্ভব কান্দাহারের দিকে যাচ্ছে। আফগান থার্ড আর্মি করপসের হেডকোয়ার্টার্স ওখানে, নিশ্চয়ই ওদের প্রয়োজনে। ফ্রন্টিয়ারের দিকে মুভ করছে ওরা। তবে মুশকিল যে শুধু ট্যাঙ্কারই যাচ্ছে না, সাথে এসকর্টও।

রাস্তা থেকে ওর একটাকে ছিনতাই করার প্ল্যান শুরুই করে দিয়েছিল মাসুদ রানা, এসকর্টের কথা শুনে ক্ষ্যান্ত দিয়ে অন্য লাইনে মাথা খাটাতে লাগল।

'একটা বুদ্ধি পেয়েছি!' বলে উঠল হেকমত আলি। 'মনে হয় কাজ হবে।'

'কি বুদ্ধি?' প্রশ্ন করল সদরউদ্দিন।

প্রত্যেকের নজর ওর ওপর সেঁটে আছে দেখে কিছুটা দ্বিধায় পড়ে গেল সে, আমতা আমতা করতে লাগল। 'না, মানে...'

'আহা, বলোই না।'

রানাও উৎসাহ দিল মাথা ঝাঁকিয়ে। 'বলো।'

'মানে, আমরা তো ইনফ্রা-রেড হেডলাইটে চলছি, বালবের দরকার হচ্ছে না। তাই ভাবছি ওর কয়েকটা খুলে কোন পথের মোড়ে ব্যাটারি দিয়ে জ্বালাবার ব্যবস্থা করব কি না।'

'কি করতে চাইছ?' চোখ কুঁচকে বলল ও।

খুলে জানাল হেকমত আলি। সবার পছন্দ হলো তার প্ল্যান, অনুমোদনের জন্যে রানার দিকে ঘুরে গেল সব ক'টা মাথা।

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে মাথা দোলাল ও। 'ঠিক আছে।'

রাত সাড়ে দশটা। মারুফ-জালালাবাদ হাইওয়ে।

ট্যাঙ্কার ড্রাইভার জানতেও পারল না বাঁক ঘুরতেই তার পিছনের দুই চাকায় গুলি করা হয়েছে। গুলির আওয়াজ হয়নি, কারণ সাইলেন্সার পরানো ছিল অস্ত্রে। ট্যাঙ্কারের গতি পড়ে আসছে দেখে বিস্মিত হলো কেবল লোকটা। পিছনের চারটে হেভিডিউটি টায়ারই গেছে, মনে হচ্ছে খামোকাই ঘুরছে রিয়ার অ্যাক্সেল।

তার এটাও জানা হলো না যে তাকে অনুসরণরত এসকর্ট লরিও পড়েছে আরেক যন্ত্রণায়। ট্যাঙ্কারের গজ ত্রিশেক পিছনে ছিল ওটা, ঢিপির মত বড় এক বোল্ডারের পাশ ঘেঁষে বাঁক নিতেই ব্যাপারটা ঘটল। এক্কেবারে থুতনি বরাবর সামনে, মাত্র কয়েক গজ দূরে আচমকা একজোড়া শক্তিশালী হেডলাইট জ্বলে উঠতে দেখে সশব্দে আঁতকে উঠেই সজোরে ব্রেক কষল লরির ড্রাইভার। আত্মা উড়ে গেছে।

ওটা যাই হোক, মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়ানোর যে কোন উপায়ই নেই, সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলল সে। তবু শেষ চেষ্টা করতে ছাড়ল না, দাঁতমুখ খিঁচে বন্-বন্ করে হুইল ঘোরাল ডানদিকে, রাস্তা ছেড়ে মরুভূমিতে নেমে পড়ল। বিনা নোটিসে ঘুরে যাওয়া ড্রাইভারের বাঁ দিকে বসা দুই সশস্ত্র এসকর্টের বাইরেরজনের মাথা দরজার ফ্রেমে বাড়ি খেল দড়াম করে। মুহূর্তে মাথা ফেটে রক্তারক্তি কাণ্ড বেধে গেল।

পরক্ষণে উঁচু রাস্তা থেকে মরুভূমিতে ল্যান্ড করল সামনের দুই

চাকা, ভয়াবহ আওয়াজ উঠল সংঘর্ষের। এই চোটটা গেল মাঝখানের এসকর্টের ওপর দিয়ে। সঙ্কীর্ণ ক্যাবে দু'পাশের চাপে জড়োসড়ো হয়ে বসে ছিল সে, প্রথমবার তাই হেলে পড়ার হাত থেকে বাধার কারণে রেহাই পেয়েছিল, কিন্তু এবার পেল না। লরি আছাড় খাওয়ামাত্র তার মাথাও ভীষণভাবে ঠুকে গেল স্টিয়ারিং হুইলের সাথে। সামান্য 'আঁ!', 'ওঁ!' করার সময়ও পেল না সে, জ্ঞান হারিয়ে হুড়মুড় করে ক্যাবের মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল।

ধাক্কা সামলে ওঠার সময় পেল না ড্রাইভার, হেডলাইটের আলোয় তিন-চারজন দেশী সৈনিক সাব-মেশিনগান তাক্ করে ছুটে আসছে দেখে অবাক হয়ে ভাবল, কি হচ্ছে এসব? একজন ঝট্কা মেরে খুলে ফেলল ক্যাবডোর। অনেক চেষ্টা করল ড্রাইভার যে ওদের বলে, ভুল করছেন আপনারা। আমি আপনাদেরই একজন। কিন্তু লোকগুলোর চেহারা দেখে মুখ খুলতে সাহস হলো না। মাথার পাশে বাড়ি খেয়ে ঢলে পড়ল সে।

একই ব্যাপার ঘটল ট্যাঙ্কার ড্রাইভার ও তার সহকারীর বেলায়।

আধঘণ্টা পর, দুই পিঙ্ক প্যান্থারের ট্যাঙ্ক আর এক্সট্রা জেরি ক্যান ভর্তি পেট্রল নিয়ে নিজেদের পথে ছুটল থান্ডারবোল্ট টীম।

বাঘলান। এক ঘণ্টা আগের কথা।

ভেতরে ভেতরে আবার কোন্ খেলা শুরু হয়েছে বুঝতে পারছে না জালাল আহমেদ। গার্ডরা হঠাৎ ওর ওপর এত সদয় হলো কেন ভেবে পাচ্ছে না।

চেয়ারের পায়া ভাঙার পর ওটা ব্যবহারের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল সে, কিন্তু হারামজাদা গার্ড সেদিন আসেইনি ভেতরে। তার পেট ব্যথার অভিনয়, অসুস্থতার ভান ইত্যাদি দেখেও না

দেখার ভান করেছে। এতদিন ভেতরে এসে খাবার রেখে যেত শালারা, সেদিন তাও করেনি। দরজার নিচে ছোট এক ফাঁক আছে, সেখান দিয়ে ঠেলে দিয়েছে ভেতরে।

কাল দুপুর পর্যন্ত একই আচরণ করেছে ব্যাটারা, তারপর কেন কে জানে, বিকেলে ভোল একেবারেই পাল্টে ফেলল। খাবার ভেতরে এসে তো দিয়েইছে, দু'তিন ঘণ্টা পর পর চা-ও দিয়ে গেছে। অবশ্য একটু সমস্যা হয়েছিল। চেয়ারের একটা পা যে ভাঙা, তা আবিষ্কার করে হাসি মুছে গিয়েছিল গার্ডের মুখ থেকে। অবশ্য তা নিয়ে কিছু বলেনি সে, আরেক গার্ডকে ডেকে এনে ভাঙা পায়া খুঁজে বের করে নিয়ে গেছে। চেয়ারটাও।

রাতে কর্নেল মুরাদ এসেছিল, জালাল জানে, তার গলা শুনেছে সে। অথচ তার সেলে আসেনি লোকটা। ওপরতলায় কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে চলে গেছে। তারপর থেকে খাতির আরও বেড়ে গেছে তার। কেন? শেষ খাওয়া খাইয়ে নিচ্ছে? তাকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত পাকা হয়ে গেছে?

কিন্তু সে-ও এত সহজে হাল ছাড়ার বান্দা নয়। দুপুরে সন্দেহটা মনে জাগার পর অনেক ভেবে আরেক ফন্দি এঁটেছে জালাল, এখন সেটা কার্যকর করতে যাচ্ছে। অন্ধকার সেল থেকে হাঁক ছাড়ল সে, 'গার্ড! গার্ড!'

ওপাশ থেকে ঘুম জড়ানো জবাব এল, 'কি হয়েছে?'

'তোমাদের ইন-চার্জ কে আছে, তাকে একবার আসতে বলো।'

'কেন?'

'আমি আমার অপরাধ কবুল করে জবানবন্দি দেব।'

'কি!'

'হ্যাঁ, সত্যি। জলদি ডাকো তাকে। নয়তো কর্নেল মুরাদ বা

মন্ত্রী বরকতী, যাকে হোক খবর দাও।'

'কিন্তু...'

'কথা বাড়িয়ে সময় নষ্ট কোরো না!' ধমকে উঠল জালাল। 'রেইডার পার্টি এখন কোন এলাকায় আছে আমি জানি। তাড়াতাড়ি করলে হয়তো ওদের ধরতে পারবে তোমরা। এখনও সময় আছে।'

বেশ কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল, সাড়া নেই গার্ডের। তাই দেখে অস্থির হয়ে উঠল সে। 'কি হলো! তাড়াতাড়ি করো!'

'কিন্তু...তেমন কেউ তো নেই এখানে। আমরা কয়েকজন মাত্র গার্ড...' মাঝপথে থেমে পড়ল সে।

হতাশ হলো যেন জালাল। 'দূর! তাহলে?' একটু বিরতি। 'তাহলে...তুমিই এসো বরং, শুনে যাও। তাড়াতাড়ি...'

'আমি!' শব্দ করে হেসে উঠল লোকটা। 'আপনি পাগল হয়েছেন? আমি শুনে কি করব?'

'বোকার মত কথা বোলো না!' জরুরী গলায় বলল জালাল। 'সব জেনে যদি টেলিফোনেও অন্তত খবরটা কর্নেলকে বা আর কাউকে জানাতে পারো, যদি ধরা পড়ে ওরা, তোমার ইজ্জত কত বাড়বে ভাবতে পারো? তার ওপর প্রমোশন, আরও কত কিছু...!'

'কিন্তু...আপনিই বা এমন অসময় কেন ব্যস্ত হলেন জবানবন্দি দিতে?' দ্বিধা কাটছে না লোকটার। 'এতদিন ধরে কতরকম...'

এবার মোক্ষম অস্ত্র ঝাড়ল জালাল। রাগ-বিরক্তি মেশানো গলায় বলল, 'আমি তোমাদের এতবড় এক সহযোগিতা করতে চাচ্ছি, অথচ তুমি অবহেলা করে অনর্থক সময় নষ্ট করছ। এই সুযোগে ওরা যদি পালিয়ে যায়, কর্নেলকে বা মন্ত্রী বরকতীকে জানাতে বাধ্য হব আমি। তখন যেন আমাকে দোষ দিয়ো না।'

লোভ, সন্দেহ, ভয় আর দ্বিধা; এতকিছুর চক্করে পড়ে দোল

খেতে লাগল গার্ড। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না কি করবে। তবে অল্প সময়ের মধ্যে প্রথম রিপুর কাছে আর সব হার মানতে বাধ্য হলো। সিদ্ধান্ত পাকা করার আগে প্রশ্ন করল সে, 'কিন্তু আপনার কি লাভ হবে তাতে?'

'আমি মুক্তি চাই। এই জন্যেই...'

'তার নিশ্চয়তা কি? যদি তারপরও ফায়ারিং...'

'নিশ্চয়তার দরকারটাই বা কি? তোমার সরকার যা জানতে চায়, তা জানিয়ে দিলে নিশ্চয়ই ছেড়ে দেয়া হবে আমাকে, কেন শুধু শুধু মারবে? এতে অবশ্য নিজের দেশের সাথে বেঈমানী করা হবে। কিন্তু প্রাণ চলে গেলে ঈমান দিয়েই বা কোন্ ঘণ্টা করব আমি?'

সামান্য বিরতি। 'ঠিক আছে, আমি আসছি। কিন্তু খবরদার, অন্য কোন মতলব করে থাকলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে বলে রাখছি।'

'সন্দেহ থাকলে তোমার সঙ্গীদের কাউকে ডেকে নিয়ে এসো না হয়,' জালাল বলল। 'তোমরা দু'জন মিলে...' স্নটে চাবি ঢোকার শব্দে থেমে গেল। বুকের মধ্যে লাফ দিল এক ঝলক গরম রক্ত।

সঙ্গীদের ডাকার কথা ভুলেও মনে ঠাঁই দিল না গার্ড। এ জন্যে বলা যায় না নগদ পুরস্কারও কিছু জুটতে পারে, তাতে কাউকেই ভাগ বসাতে দিতে রাজি নয় লোকটা। টাকা না হোক, ইজ্জত তো বাড়বে তার। ওখানেও থাবা বসাতে দেবে না সে ওদের।

'আমি আসছি,' বলল লোকটা। 'দু'হাত কোলের ওপর রেখে চুপ করে বসে থাকুন কটে।'

'তাই তো আছি।' মনে মনে বলল, আয়, কুত্তার বাচ্চা!

ভারী স্টীলের দরজা খানিকটা ফাঁকা হলো, পরক্ষণে বিস্মিত গলায় বলে উঠল গার্ড, 'এ কি! সেল অন্ধকার কেন?' বলতে

বলতে দ্রুত টর্চলাইট জ্বালল। চেপে রাখা দম ছাড়ল বন্দীকে ভদ্রলোকের মত কটে বসা দেখে। 'আলো নেভানো কেন?'

গলা টান করে করিডরের আলো দেখল জালাল। যেন কিছু জানে না, এমনভাবে বলল, 'আরে! বাইরে দেখছি লাইট জ্বলছে! আমি তো ভেবেছি বুঝি ইলেক্ট্রিসিটি ফেল করেছে আবার। তাহলে নিশ্চয়ই বালব্ গেছে। যাক্‌গে, এসো। দেরি করা ঠিক হবে না।'

এক হাতে কারবাইন, অন্য হাতে আলো, দুটোই ওর দিকে ধরে এক পা এগোল সে ভয়ের কিছু নেই দেখে। পরক্ষণে নাক কুঁচকে উঠল। 'কি ব্যাপার, কিসের গন্ধ? পেশাব...!'

ব্যাটার আলো নিচের দিকে নামছে না দেখে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল জালাল। সেলের আরেক মাথা ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলল, 'দুঃখিত, পায়ে লেগে পড়ে গেছে পট। অন্ধকারে দেখতে পাইনি।' আর এক পা আয়, হারামজাদা!

এগোল লোকটা, পরমুহূর্তে কিসের থেকে যে কি ঘটে গেল, টের পাওয়ার আগেই ওলট-পালট হয়ে গেল সব। দুপুরে কটের দুটো স্প্রিঙ কয়েল ছিঁড়ে বের করে টেনে লম্বা করে রেখেছিল জালাল। পরে বালব্ খুলে দুটোরই এক মাথা করে জুড়ে রাখে সকেটের সাথে। একটার অন্য মাথা ছিল দরজার সামনেই ফেলে-রাখা সারাদিনের পেশাবের পুকুরে, দ্বিতীয়টার অন্য মাথা বাঁধা ছিল তার লোহার কটের পায়ায়। নজর ওর ওপর রেখে এগোতে গিয়ে দুটোই মাড়িয়ে দিয়েছে গার্ড, সঙ্গে সঙ্গে স্পার্ক করেছে লাইন।

তীব্র নীল আলোর ঝলকানি আর ২২০ ভোল্ট বিদ্যুতের ধাক্কায় মুহূর্তের জন্যে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল লোকটা। ঠিক তখনই বাঘের মত লাফ দিল জালাল। মাথা পেঁচিয়ে ধরে এক ঝট্‌কায় ঘাড় ভেঙে দিল তার।

দশ মিনিট পর গেটের ঘুমন্ত গার্ডকে পরপারে পাঠিয়ে দিল ও, তারপর আঙিনার পিছনের ব্যারাকের গার্ডরা ঠিকমত কিছু বুঝে ওঠার আগেই মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

পাঁচ

উন্মত্তের মত গাড়ি চালাচ্ছে হেকমত আলি।

এবং পাশে বসা করপোরাল সদরউদ্দিন রীতিমত উপভোগ করছে তা। একটুও ভয় করছে না। অথচ করার কথা, কারণ সে অন্ধের মত বসে আছে। সামনে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। দেখার দরকারও নেই, এর মধ্যে হেকমতকে চেনা হয়ে গেছে তার। গাড়ি চালানো কাকে বলে, লোকটা তা ভালই জানে।

সদরউদ্দিনের নিশ্চিত ধারণা, একে যদি ওয়ার্ল্ড কাপ রেসে অংশ নিতে দেয়া হয়, নির্ঘাত হাতিয়ে নেবে কাপটা।

আহত জাফর আহমেদ অবশ্য খেপে ব্যোম হয়ে আছে ট্রুপারের ওপর। ঝাঁকিতে ব্যথা লাগছে তার। কষ্ট হচ্ছে। কয়েকবার লোকটাকে বলেও কাজ হচ্ছে না দেখে রেগে উঠেছিল সে, খেঁকিয়েছিল। পাল্টা দাঁত খিঁচানি মেরে ওকে থামিয়ে দিয়েছে হেকমত আলি। তার দেশে ফেরার তাড়া আছে।

ঢাকা থেকে আজ ব্যক্তিগত বার্তা এসেছে ওর নামে। বার্তাটা এরকম: তোমাদের প্রথম সন্তান ছেলে হয়েছে। সময়মতই জন্মেছে সে। ওজন ৭ পাউন্ড ৬ আউন্স। ছেলে তোমাকে

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে বলেছে। স্ত্রী জিনাত বলেছে, ফেরার আগে কোলিগদের কাছ থেকে শিশু পালন সম্পর্কে ইন্টেনসিভ ট্রেনিং নিয়ে রাখতে। ফেরার পর কাজে লাগবে।

জিনাতের সমস্যা ছিল, প্রসবে জটিলতা দেখা দেয়ার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভালয় ভালয় মিটে গেছে সব। তার ওপর ছেলের বাপ হয়েছে হেকমত আলি, অতএব তাকে আর পায় কে! তাছাড়া গন্তব্য ক্রমে এগিয়ে আসছে, এদিকে শত্রুরও দেখা নেই, কাজেই ছুটবে নাই বা কেন? ড্রাইভিঙের ফাঁকে বেসুরো শিসও বাজাচ্ছে লোকটা।

দিগন্ত বিস্তৃত এক মাউন্টিন বেসিন ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে অতিক্রম করছে এখন দুই প্যান্থার। এখানে সারফেস মৃদু ঢেউয়ের মত, তবে মসৃণ। ঢেউগুলো অনেকটা জায়গা নিয়ে, উত্থান বা পতন প্রায় টেরই পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে অবশ্য অগভীর, শুকনো ওয়াদি পার হওয়ার জন্যে গতি কমাতে হচ্ছে, তবে গড়পরতা ত্রিশেই রাখার চেষ্টা করছে দুই চালক।

আজ যেন প্রকৃতিও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কালো মেঘে ছেয়ে আছে আকাশ, ক্রুদ্ধ ড্রাগনের মত মোচড় খাচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে মাঝেমধ্যে, ঝিকিয়ে উঠছে চারদিক—পাহাড় চুড়ো, মরুভূমি। বাতাসে ডালপালা দুলিয়ে ওদের বিদায় জানাচ্ছে গাছগাছালি। যদি ঝড় শুরু হয়, অথবা বৃষ্টি নামে, শত্রুকে ফাঁকি দেয়া আরও সহজ হয়ে যাবে থান্ডারবোল্ট টীমের।

আরও পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে এসে পশ্চিমদিকে ঘুরে গেল দুই ল্যান্ড রোভার, এক মাউন্টিন রিজের পাশ কাটিয়ে ধুলোমোড়া সমতল প্রান্তরে উঠে শুরু করল আরেক দীর্ঘ দৌড়। আরও ত্রিশ মাইল যেতে পারলে পড়বে রেজিস্তান মরুভূমি, তারপর লান্ডি মোহাম্মদ আমিন খান হয়ে চাগাল পৌঁছতে পারলেই হলো। আর

কিছু করার থাকবে না আফগানদের।

ঘড়ি দেখল মাসুদ রানা। প্রায় একটা। পেট্রল ছিনতাইয়ের পর পুরো দুই ঘণ্টা হয়ে গেল একটানা চলছে ওরা। এরমধ্যে ষাট মাইল পেরিয়ে এসেছে, এই গতি বজায় রাখা সম্ভব হলে দুটোর মধ্যে রেজিস্তান পাসে পৌঁছে যেতে পারবে ওরা।

মরুভূমির যে অংশ সবচেয়ে কম চওড়া, সেখান দিয়ে পাড়ি ধরবে, তাতে অনেকটা সময় বাঁচবে। তবু রেজিস্তান হয়ে লান্ডি মোহাম্মদ আমিন খানকে পাশ কাটিয়ে চাগাল পৌঁছতে কম করেও দু'ঘণ্টা লাগবে। অর্থাৎ আলো ফোটার বাকি থাকবে আর এক ঘণ্টার মত। ওই সময়টাই হবে থান্ডারবোল্টের সবচেয়ে কঠিন সময়, ওর মন তাই বলছে।

ওই এক ঘণ্টাই চলতে হবে ফ্রন্টিয়ারের পাহাড়ী ফার্মল্যান্ডের মধ্যে দিয়ে। পাক বর্ডারের যেখান দিয়ে ক্রস করবে ওরা, সেখানে পৌঁছার পথ ওই একটাই। অপ্রশস্ত স্ট্রিপ। প্রচুর খামার এবং ছোট ছোট গ্রাম আছে দু'পাশে। পথে যদি কিছু না-ও ঘটে, রানা প্রায় নিশ্চিত জানে ওখানে ঘটবে। ঘটতেই হবে। কারণ ওটাই কর্নেল মুরাদের নতুন ফাঁদ পাতার একেবারে আদর্শ জায়গা।

জানে, অথচ ওই জায়গা এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই। তাই আগেই এ ব্যাপারে সদরউদ্দিনের সাথে আলোচনা সেরে রেখেছে ও। সাহসিকতা, পাল্টা হামলা এবং গতি, এই তিনের সমন্বয় ঘটিয়ে ওই ফাঁদ ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে হবে দলকে।

পেট্রলের জন্যে কম করেও এক ঘণ্টা নষ্ট হয়েছে ওদের, নইলে রানার ধারণা, এতক্ষণে আরও অন্তত ত্রিশ মাইল এগিয়ে থাকতে পারত। হয়তো এখন আমিন খানের কাছাকাছি থাকত দল।

ক্যাপ্টেন কামালের কথা ভাবল রানা। কোথায় আছে এখন

আলমগীর? উপকূলের কত মাইল দূরে? বাতাস ভেজা ভেজা লাগছে টের পেয়ে মুখ তুলে আকাশ দেখল। মেঘ আরও গাঢ়, আরও কালো হয়েছে। যে কোন মুহূর্তে বৃষ্টি নামবে। পিছনে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, হয়তো শুরুই হয়ে গেছে ওদিকে কোথাও।

চট্টগ্রাম থেকে রওনা হয়ে আসার পর থেকে এ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, সব এক এক করে মনে পড়ছে ওর। খারাপ লাগছে সার্জেন্ট শহীদুল্লাহর কথা ভেবে। অন্তত ওর মত একজনকে হারাতে হবে, ভুলেও কখনও কল্পনা করেনি রানা। ওরকম সর্বগুণে গুণী কমান্ডোকে হারিয়ে অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গেল বিসিআইয়ের। সে ক্ষতি কোনদিন পূরণ হবে কি না, হলে কবে, কত যুগ পরে, কে জানে?

তার সাথে আছে জালাল আহমেদ। ওই ছেলেও কোন অংশে কম ছিল না। হামিদার কথা ভাবল ও। ভারি মিষ্টি চেহারার মেয়ে ছিল, চোখ দুটো কি আশ্চর্য মায়াভরা। দু'জনকে পাশাপাশি ভালই লাগছিল দেখতে, চমৎকার মানিয়েছিল। কি ঘটেছে ওদের ভাগ্যে? আসেনি কেন? ধরা পড়েছে? নাকি...

গাড়ির জোর ঝাঁকিতে চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল, নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল রানা। সামনে মন দিল।

বাঘলান। রাত তিনটা।

ভিলার নিজের অফিসে চুপ করে বসে আছে কর্নেল নাজাফ মুরাদ। কপাল কুঁচকে আছে, চেহারায় ক্লান্তি আর বিরক্তি। ভেতরে ঢোকার সময় একটা লাশ ডিঙিয়ে এসেছে সে, ওদিকে আরেক লাশ পড়ে আছে বাংলাদেশী স্পাইটার সেলে। তাও কি না পেশাবের মধ্যে! আশ্চর্য!

এক আধমরা বন্দীকে আটকে রাখার যোগ্যতাও এদের নেই,

আছে কি তাহলে? এই সমস্ত পাগল-ছাগল, ভেড়ার রাখাল করবে দেশ শাসন? ইয়া আল্লাহ্, রক্ষা করো তুমি আফগানিস্তানকে।

কেন্ট ধরাল কর্নেল। মুখোমুখি বসা এইডকে দেখল। দৌড়ঝাঁপ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে, ডিমে তা দেয়া মুরগির মত ঝিমাচ্ছে, ঢুলছে। একটু একটু করে চিন্তার লাইন ঘুরে গেল মুরাদের। একদিকের দেয়ালে আগেরবার টাঙিয়ে রেখে যাওয়া প্রকাণ্ড ক্লোজ ডিটেইল ওয়াল ম্যাপটার দিকে তাকিয়ে আছে আনমনে। বাংলাদেশী রেসকিউ টীমটার কোর্স লাল মাথার পিন দিয়ে দেখানো আছে ওটায়।

ওই দলের সদস্যদের কথা ভাবল কর্নেল, দলনেতার কথা ভাবল। দেখতে কেমন সে? তার দক্ষতা, অভিজ্ঞতা আর ধূর্ততার যে কোন তুলনা হয় না, তাতে কোন সন্দেহ নেই মুরাদের। এ পর্যন্ত যা দেখিয়েছে, শত্রু হলেও তার প্রশংসা না করে পারা যায় না। লোকটার সঙ্গীদেরও প্রশংসা করতে হয়। দুই রাত আগে তার এত যত্নে পাতা অ্যামবুশ যে ভাবে ব্যর্থ করে দিয়ে গেছে ওরা, কোন তুলনা হয় না তার। সেদিনের ব্যর্থতার জন্যে তাকে জবাবদিহি করতে হবে, মুরাদ জানে।

তাই প্রেসিডেন্টের সাথে যোগাযোগ করছে না এখন। বরকতীকেও ওর সঙ্গে যোগাযোগ করার সুযোগ দিচ্ছে না। প্রায় গোপনেই কাবুল-বাঘলান করছে সে। আশা ছিল, দেরি কিছুটা হলেও একবারে রেইডার পার্টিকে পাকড়াও করে বুক ফুলিয়ে প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করতে যাবে, কিন্তু...আজ আবার যে নতুন দুর্ঘটনা ঘটে গেল এখানে, তাতে আত্মবিশ্বাস অনেকখানি টলে গেছে কর্নেলের।

ঘুরেফিরে আবার রেইডার পার্টির লীডারের কথা খেয়াল হলো। দেখতে কেমন সে? কোন ধাতুতে গড়া? রেইডের দিন যে

লোকটা ধরা পড়েছিল, সেই কি লীডার? গার্ডের তৈরি গরম চায়ে চুমুক দিল কর্নেল, মগ হাতে উঠে গিয়ে দাঁড়াল ম্যাপটার সামনে। ওদের এস্কেপ কোর্সের দিকে তাকিয়ে থাকল চিন্তিত চেহারায়। চোরাই জেট রেঞ্জার যেখানে ক্র্যাশ করেছিল, সেখান থেকে শুরু হয়েছে ওটা। তারপর এঁকেবেঁকে দক্ষিণে গেছে ওয়াদির সেই অ্যামবুশ স্পটের দিকে। ওখানে টাইপ করা লেবেল সাঁটা আছে। লেবেলের তারিখ ২১/৯/১৯৯···। গতকালকের আগের দিনের তারিখ ওটা।

কর্নেলের নতুন নির্দেশ পালিত হয়েছে সময়মত। চিনূকের রিপ্লেসমেন্ট আর এক প্লাটুন ক্র্যাক ট্রুপ সম্পূর্ণ তার অধীনে আছে এখন। অ্যাকশনে আছে। হাই কমান্ডের ওদের সাথে যোগাযোগের পথ বন্ধ করে দিয়েছে কর্নেল, চেষ্টা করলেও ওই প্লাটুনকে কোন নির্দেশ দিতে পারবে না এখন ওরা। ওদিকে সে রাতের অ্যামবুশে প্রাণহানী বা ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট এখনও চেপে রেখেছে কর্নেল, জানায়নি। জানতে চায়ওনি হাই কমান্ড, সীমান্ত নিয়ে অনেক ব্যস্ত ওরা, এদিকে নজর দেয়ার সময় নেই। ভালই হয়েছে।

এইডের দিকে ঘুরল সে। 'ওপরে যাও, দেখো কোন নতুন খবর আছে কি না।'

'ইয়েস্, স্যার,' উঠে পড়ল সে। দ্রুত চলে গেল কমিউনিকেশনস রুমের দিকে। দরজা বন্ধ হয়ে যেতে ফের ম্যাপে মন দিল মুরাদ। কিন্তু আপন চিন্তায় ডুবে যাওয়ার সময় পেল না, মাত্র দু'মিনিটের মাথায় ফিরে এল এইড। চেহারায় হাসি হাসি ভাব। ঘুম উবে গেছে।

'আছে কোন খবর?'

'মনে হয়, স্যার।'

খালি মগ রেখে নতুন সিগারেট ধরাল মুরাদ। খেয়াল করল হাত কাঁপছে অল্প অল্প। 'কি?'

'মারুফের বাইরে একটা ফুয়েল ট্যাঙ্কার ছিনতাই হয়েছে, স্যার। কয়েক ঘণ্টা আগে। ওটার এসকর্ট ভেহিকেলও।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। ওটার দুই ট্রুপার, ড্রাইভার, এদিকে ট্যাঙ্কারের ড্রাইভার-হেলপার, সবাইকে অজ্ঞান করে অনেকখানি তেল নিয়ে গেছে কারা যেন।'

'তারপর?'

'ওরা বলছে লোকগুলো নাকি আমাদের ব্যাটল ড্রেস পরা ছিল।'

মাথা দোলাল অন্যমনস্ক কর্নেল। 'খুব স্বাভাবিক।' কয়েক পা গিয়ে ডেস্ক থেকে একটা লাল পিন নিয়ে ফিরে এল সে, মারুফের ওপর গেঁথে দিল। ওটার কাছেই একটা নীল পিন গাঁথা—কর্নেলের আগের আর্মি প্লাটুনের বেঁচে যাওয়া সদস্যরা আছে ওখানে। ওটার খানিকটা বাঁয়ে আছে আরও এক নীল পিন। নতুন ক্র্যাক প্লাটুনের অবস্থান দেখাচ্ছে ওটা।

পিন স্থির হলেও ওরা স্থির নেই, চলার ওপর আছে। হিসেবে কোন ভুল হয়নি, কর্নেল ভাবল সন্তুষ্ট হয়ে, তার অনুমান করা পথ দিয়েই যাচ্ছে ওরা।

তার কাঁধের ওপর দিয়ে পিনগুলো দেখল এইড, তারপর অনিশ্চিত চোখে কর্নেলের দিকে তাকাল। 'আপনার কি মনে হয়, স্যার, ওদের ধরা যাবে তো?'

'কোন সন্দেহ নেই তাতে,' হেসে বলল সে। 'ধরা দেয়ার জন্যেই এই পথে এগোচ্ছে ওরা, মাই ডিয়ার।'

'জ্বি, স্যার?'

'এবার আমাদের ফাইনাল ফাঁদে ধরা দিতে যাচ্ছে ওরা। আগেরবার যা ঘটেছে ঘটেছে, এবার আর রেহাই নেই।'

'তাহলে···আমাদের যাওয়া উচিত না এখন?'

'উঁহুঁ, আরেকটু অপেক্ষা করা উচিত।'

বিরান প্রান্তর মুহূর্তে মুহূর্তে পিছিয়ে যাচ্ছে। ডানা গজিয়েছে যেন দুই পিঙ্ক প্যান্থারের, সাঁ-সাঁ করে উড়ে চলেছে। পিছনে কালির মত দিগন্তে ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে আফগান মেইনল্যান্ড। যাত্রীদের কারও মুখে কথা নেই।

মাটি এদিকে বেশ ঢালু। এতে আরও সুবিধে হয়েছে ওদের, গতি বেড়ে গেছে। বাতাসের আর্দ্রতা অনেক বেশি এখানে, টের পেল মাসুদ রানা। গাছপালাও ঘন। এখানে-ওখানে ছোট, পানি ভর্তি ডোবা-নালা দেখা যাচ্ছে মাঝেমধ্যে। আকাশের মুখ এখনও ভার, বৃষ্টি নামব নামব করছে বহু আগে থেকে। নামছে না।

একটু পর ফার্মল্যান্ডে ঢুকে পড়ল ওরা। সবার চোখ একেকটা দূরবীন হয়ে গেল বিপদের আশঙ্কায়। পুব আকাশে সবে ভোরের আলোর আভাস দেখা দিতে শুরু করেছে তখন।

'অবস্থা সুবিধের মনে হচ্ছে না, বস্,' অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল সদরউদ্দিন। 'সামনে অনেক লোকজন চোখে পড়ছে। ওভার।'

সত্যিই তাই, রানাও দেখতে পাচ্ছে বিদ্যুৎ চমকের আলোয়। ভোর হয়ে আসছে বলে চাষীরা একজন-দু'জন করে ঘর ছাড়তে শুরু করেছে, মাঠের দিকে যাচ্ছে। আসন্ন ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা ঘরে বসিয়ে রাখতে পারেনি ওদের।

'চালিয়ে যাও, করপোরাল,' গলা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বলল ও। 'এ ছাড়া উপায়ও নেই। তাছাড়া ওরা সাধারণ,

আমাদেরকে নিজেদের রিইনফোর্সমেন্ট ছাড়া অন্য কিছু ভাববে বলে মনে হয় না।'

'আরেকটা কথা, বস্। আপনার ডিরেকশনে মনে হয় কোন ভুল আছে। বোধহয় ভুল পথে যাচ্ছি আমরা।'

নিঃশব্দে হেসে উঠল ও। 'টেকনিক্যালিটি, প্যান্থার ওয়ান, আ টেকনিক্যালিটি। জাস্ট পুশ অন। আউট।'

পিছনে মেঝেতে বসা যূথী উঠে বসে রানার দিকে ঝুঁকল। 'দিন হওয়ার আগে জায়গামত পৌঁছতে পারব তো আমরা, মেজর?'

'মাথা যদি উইন্ডো লেভেলের নিচে না রাখেন, তাহলে সম্ভাবনা কম,' গম্ভীর স্বরে জবাব দিল ও। 'আফগান রিইনফোর্সমেন্টে মেয়ে নেই, সবাই জানে। পরেরবার মাথা তোলার দরকার হলে দয়া করে চুল সামলে নেবেন।'

লজ্জা পেয়ে নাক কোঁচকাল মেয়েটি। ঠোঁট টিপে হাসল। 'ইয়েস, বস্!'

হঠাৎ কড়া ব্রেক কষল ফয়েজ আহমেদ, কয়েক গজ স্কিড করে দাঁড়িয়ে পড়ল ল্যান্ড রোভার। 'শা-লা!' বলল সে।

'কি হলো?' প্রশ্ন করল রানা, তবে জবাব শোনার দরকার হলো না। নিজের চোখেই দেখতে পেল।

হেভি আর্টিলারির মত গুড় গুড় মেঘ ডাকছে সামনে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে একটু পরপর। সে আলোয় কয়েকশো গজ সামনে প্যান্থার ওয়ানকে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। বড় এক পাল গরু ওটার পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। মেঘের ডাকে ভয় পেয়ে উল্টোপাল্টা আচরণ করছে পশুগুলো, রাখালের নির্দেশ মানছে না। পুরো ট্র্যাক বন্ধ করে দিয়েছে।

গ্রামের পথে এ দৃশ্য সাধারণ, সন্দেহের কিছু নেই। তবু

সন্দেহ হলো রানার। ওদিকে সদরউদ্দিনেরও একই সন্দেহ জাগল। বুঝে ফেলল এটা ছদ্মবেশী হোল্ড-আপ ছাড়া কিছু নয়। বিপদ টের পেয়ে রেডিওতে কথা বলতে শুরু করেছে, তখনই কমপক্ষে আধডজন ট্রুপারের ওপর চোখ পড়ল তার। আরও প্রায় দুশো গজ সামনের একটা মাটির ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে আসতে শুরু করেছে।

রানাও দেখল ওদের, সঙ্গে সঙ্গে ছাঁৎ করে উঠল বুকের মধ্যে। একই মুহূর্তে আরও একটা জিনিস দেখতে পেল। ট্রুপাররা যে ঘর থেকে বেরিয়েছে, তার পিছনের বড় এক বাগানের গাছ পালার আড়ালে আরেকটা চিনূক দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ জোর বাতাসে ঝোপ দুলে ওঠায় পলকেরও কম সময়ের জন্যে দেখা গেছে ওটার লেজ, নইলে…

ফয়েজের পাঁজরে কনুই দিয়ে মৃদু গুঁতো মারল ও। 'কুইক। ব্যাক করো, গাড়ি ঘোরাও, হারি আপ্!' পরক্ষণে সদরউদ্দিনের সবে আরম্ভ হওয়া সতর্কবাণীতে বাধা দিল। 'জানি, করপোরাল। দেখতে পেয়েছি আমি। আমরা পিছাচ্ছি, ফলো করো। আউট!'

ততক্ষণে নিপুণ দক্ষতার সাথে প্রায় জায়গায় গাড়ি ঘুরিয়ে ফেলেছে ফয়েজ, পুরো থেমে দাঁড়ানোর আগেই উল্টোদিকে ছুটিয়ে দিয়েছে।

'বস্!' চেঁচিয়ে বলল জাহাঙ্গীর। 'আধ মাইল আগে একটা ব্রিজ পেরিয়ে এসেছি আমরা, একটা ওয়াদির ব্রিজ। ওই ওয়াদি ব্যবহার করা যায় না?'

মাথা দোলাল রানা। 'তাই করতে যাচ্ছি।'

চাগাল পাহাড়ের এক পরিত্যক্ত খনির বাতাস চলাচলের শ্যাফট ওদের এপারের শেষ গন্তব্য। প্রায় তিন মাইল লম্বা শ্যাফট ওটা, অন্য মাথা পাকিস্তানে গিয়ে শেষ হয়েছে। ওটাও চাগাল

পাহাড়েরই অন্য মাথায়। ওই পথে বেরিয়ে ঘুরপথে ও দেশের উপকূলীয় গ্রাম গদার হয়ে বিএনএস আলমগীরে উঠবে ওরা।

শ্যাফটটা অনেক পুরানো, সন্দেহ ছিল এতদিনে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু প্ল্যান চূড়ান্ত করার আগে রানা খবর নিয়ে জেনেছে খোলাই আছে। পাকিস্তান প্রান্ত অবশ্য পাথর ধসিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল সরকার, পরে চোরাচালানীরা আবার চালু করেছে। এই পথে যাওয়া গেলে অল্প সময়ে ওখানে পৌঁছানো যেত, কিন্তু হলো না। এখন যেতে হবে অনেক ঘুরপথে।

তা হোক, ভাবল রানা, তবু আফগানদের বাই-পাস করা গেলে হয়।

ব্রিজে উঠে গাড়ি দাঁড় করাল ফয়েজ, গলা বাড়িয়ে নিচে তাকাল। বারো ফুট নিচে পাথুরে ওয়াদি বেডের ওপর দিয়ে পানির ক্ষীণ একটা ধারা বয়ে চলেছে। তার মধ্যে দিয়ে তলা দেখা যায় পরিষ্কার। পানি দুই কি তিন ইঞ্চির বেশি গভীর বলে মনে হয় না।

'মনে হচ্ছে অসুবিধে হবে না,' বলল ফয়েজ। 'যাওয়া যাবে।'

'চলো তাহলে,' রানা মাথা ঝাঁকাল। 'আমরাই আগে থাকি এবার।'

ফার্স্ট গিয়ার দিল লোকটা, ব্রিজ পার হয়ে কিনারা বেয়ে নামতে শুরু করল। কিছুটা এঞ্জিনের শক্তি, বাকিটা ঢালু কিনারা দ্রুত গড়িয়ে নিয়ে চলল ভারী পিঙ্ক প্যান্থার টুকে।

বাঘলান। ভোর সাড়ে পাঁচটা।

এইডের ব্যস্ত গলার ডাকাডাকিতে কাঁচা ঘুম ভেঙে গেল কর্নেল মুরাদের। মাথা তুলে পায়ের কাছে দোরগোড়ায় দাঁড়ানো এইডকে দেখল সে চোখ কুঁচকে। উত্তেজিত দেখাচ্ছে যুবককে।

'খবর এসেছে, স্যার!' চ্যাঁচাল সে। 'জরুরী খবর এসেছে রেইডার পার্টি সম্পর্কে!'

কর্নেল খুব একটা ব্যস্ততা দেখাল না। হাত তুলে ঘড়িতে চোখ বোলাল একবার, খাটের বাইরে পা ঝুলিয়ে বসে হাই তুলল মুখের সামনে তুড়ি বাজিয়ে। 'খুব খুশি মনে হচ্ছে? কি খবর এসেছে?'

'মাত্র কয়েক মিনিট আগে ওদের লোকেট করেছি আমরা, স্যার!' গর্বের সাথে বলল লেফটেন্যান্ট, যেন নিজেই করেছে সে কাজটা। 'চাগাল পাহাড়ের কাছের এক গ্রামে। রাখালরা ওদের আটকাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ঘুরে কেটে পড়েছে ব্যাটারা। অবশ্য ফাঁকি দিতে পারেনি, ট্রুপস পিছু নিয়েছে। এবার আর পালাতে হচ্ছে না!'

উঠে পড়ল কর্নেল। তৈরি হতে শুরু করল, তবে হুড়োহুড়ি করল না। 'জায়গাটা কোথায়, ম্যাপে পয়েন্ট করে দেখাও।'

তাই করল যুবক, ব্যগ্র হয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় একটা লাল পিন টিপে বসিয়ে দিল। 'এখানে, স্যার, এখানে!'

'হুঁমম! সেই জায়গা না, যেখানে চাগাল মাইনিং শ্যাফট...?'

'জ্বি-জ্বি!'

'ওদের তাড়া করা হচ্ছে তো?'

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল এইড। 'হচ্ছে।'

সন্তুষ্টি ফুটল কর্নেলের ফোলা চেহারায়। 'এবার তাহলে যাওয়া যেতে পারে।'

আধঘণ্টা পরের কথা।

প্যাস্থার ওয়ানের পিছনে বসা জাফর আহমদ রুদ্ধশ্বাস গলায় বলে উঠল, 'সর্বনাশ! হেকমত, পিছিয়ে পড়ছি আমরা! ওরা

অনেক কাছে এসে পড়েছে!'

নিজের সীটে ঘুরে বসল করপোরাল সদরউদ্দিন। ঠিকই বলেছে ট্রুপার, ওদের ধরার জন্যে পিছনের আফগান জীপটা মরিয়া হয়ে ছুটছে। ওজনে অনেক হাল্কা ওটা। প্রতি মুহূর্তে ইঞ্চি ইঞ্চি করে মাঝের ব্যবধান কমিয়ে আনছে। ভেজা বলে ওয়াদির মাটি কিছুটা নরম, তাই সিকি টনী পিঙ্ক প্যান্থার গতি বাড়িয়েও সুবিধে করতে পারছে না। এই সুযোগ ষোলো আনাই নিচ্ছে ধাওয়াকারী।

'দেব উড়িয়ে?' জাফর বলল।

'না! ওরা জেনেছে জানুক, ওদের বন্ধুদের আমাদের লোকেশন জানতে দেয়া ঠিক হবে না। সামনের প্যান্থারকে ওরা হয়তো এখনও দেখেনি।' হেকমত আলির দিকে ফিরল করপোরাল। 'আরেকটু জোরে চালিয়ে ওদের অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে গেলে কেমন হয়, হেকমত?'

'খুব রিস্কি হয়ে যাবে,' জবাব দিল সে দাঁতের ফাঁক দিয়ে।

'তবু, মাসুদ ভাইরা অন্তত সরে যেতে পারবেন তাহলে।'

চেহারা দেখে বোঝা গেল পরামর্শ পছন্দ হয়নি তার, তবু রাজি হয়ে গেল বিনা দ্বিধায়। 'ঠিক আছে। শক্ত হয়ে বোসো সবাই।'

কথা পুরো শেষ না হতেই হ্যান্ডব্রেক চেপে ধরল হেকমত, পর মুহূর্তে স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে দিল তীরের দিকে। গুলি খাওয়া বাঘের মত লাফ দিল প্যান্থার ওয়ান, বিপজ্জনকভাবে কাত হয়ে উঠে পড়ল পানি ছেড়ে। কয়েক সেকেন্ড ব্যস্ত হয়ে গাড়ি ঘোরাবার জায়গা খুঁজল লোকটা, পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার হুইল ঘুরিয়ে দিয়েই এক্সিলারেটর ঠেসে ধরল ফ্লোরবোর্ডে। পিছনের টায়ারের তাড়নায় ঘন ধুলোর ঝড় উঠল, আশঙ্কাজনক খাড়া পাড় ধরে

সতর্কতার সাথে থ্রী পয়েন্ট টার্ন নিল হেকমত আলি, পরমুহূর্তে আফগান জীপের ড্রাইভার-আরোহীকে পুরো আহাম্মক বানিয়ে ঘুরে গেল উল্টোদিকে। অপ্রশস্ত ওয়াদি বেডে ওদের এগোবার পথ প্রায় আটকে দিয়েছে সে।

তুমুল গতিতে ছুটে আসতে থাকা আফগান জীপ তখন অনেক কাছে এসে পড়েছে। সামনেরটা এমন কাজ কেন করল ওটার ড্রাইভার বুঝল ঠিকই, কিন্তু একটু দেরিতে। কিছু করার সময় নেই তখন। ব্রেকে যে কাজ হবে না, তা জানে সে। মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়ানোর এখন একটাই পথ আছে, কিন্তু সেটা বিপজ্জনক। অথচ না করেও উপায় নেই, কাজেই তাই করতে তৈরি হলো সে।

ড্রাইভিঙে হেকমত আলির অভিজ্ঞতার সিকিভাগও যদি তার থাকত, তাহলে হয়তো বুঝত তার গাড়ি আর সামনের অদ্ভুত ল্যান্ড রোভারের মধ্যে ওজনের আকাশ-পাতাল তফাত আছে, ওটা যা করতে পারে, তারটা তা পারে না। কিন্তু চিন্তাটা মাথায়ই এল না, সরাসরি সংঘর্ষ এড়ানোর জন্যে বাঁ দিকের ঢালে কোনাকুনি গাড়ি তুলে দিল লোকটা। উত্তেজনার মাথায় হুইল একটু বেশিই ঘুরিয়ে ফেলেছিল, অসম্ভব এক অ্যাঙ্গেলে ঢালে উঠে পড়ল গাড়ি।

ভালই এগোল কয়েক গজ, তারপর গ্র্যাভিটির কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায় রইল না। বেশি কাত হয়ে পড়ায় ওপরদিকের দুই টায়ার মাটির সংস্পর্শ হারিয়ে ফেলল মুহূর্তে, তারপরও দু'গজের মত এগোল ওটা, অবশেষে উল্টে পড়তে শুরু করল। খুব দ্রুত তিনটা ডিগবাজি খেল জীপ, আপার ফ্রেমওয়র্ক-উইন্ডশীল্ড চুরমার হওয়ার শব্দে দাঁড়িয়ে থাকা পিঙ্ক প্যান্থারের আরোহীদের গাল কুঁচকে উঠল। ফ্রেমওয়র্কের সাথে ওটার দুই আরোহীর হাড়গোড়ও গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল দেখতে দেখতে।

চার চাকা আসমানে তুলে ওয়াদি বেডে স্থির হলো জীপ।

হেকমত আলি সেদিকে তাকিয়ে আছে নির্বিকার চেহারায়। 'মামলা খতম।'

'কী ভয়ঙ্কর!' জাফর মন্তব্য করল পিছন থেকে।

সদরউদ্দিন দাঁত বের করে হাসছে। কনুই দিয়ে হেকমতের পাঁজরে গুঁতো মারল সে। 'দারুণ দেখিয়েছ, নাটকু। এবার চলো, মাসুদ ভাইদের ধরতে হবে।'

গাড়ি ঘুরিয়ে ওপরে তুলে আনল সে ধীরেসুস্থে, তারপর ওয়াদির তীর ধরে হাঁ-হাঁ করে দৌড় শুরু করল। টানা দশ মিনিট ছোটার পর সামনে আবছামত দেখা গেল প্যান্থার টুকে। ওয়াদি বেড়ে দাঁড়িয়ে আছে। ব্রেক কষল হেকমত আলি।

'কি হলো?' বলতে বলতে নেমে পড়ল সদরউদ্দিন।

ঝুঁকে ওটার পিছনের অফসাইড হুইল পরীক্ষা করছিল রানা ও ফয়েজ মোহাম্মদ, ওয়ানের আওয়াজ শুনে সোজা হলো। 'রিয়ার অ্যাক্সেল গেছে,' ফয়েজ বলল ওদের উদ্দেশে। 'বড় এক গর্তে পড়ে ভেঙে গেছে।'

এঞ্জিন অফ করে হেকমত আলিও নামল এবার, দৌড়ে নেমে পড়ল নিচে। 'কই, কি হয়েছে, দেখি!'

'লাভ নেই,' মাথা দোলাল রানা। 'চলবে না। এটাকে ফেলে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

ওপরে দাঁড়ানো সদরউদ্দিন হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনে কান খাড়া করল, পরমুহূর্তে ঝট্ করে সামনের দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার, চোয়াল ঝুলে পড়ল। 'মাসুদ ভাই! জলদি উঠে আসুন সবাই। পানি...!'

চোখ কুঁচকে কান পাতল ও, পরক্ষণে পিলে চমকে গেল। সর্বনাশ! পশম দাঁড় করানো শোঁ-শোঁ, ছল ছল, নানান শব্দ তুলে পানি ছুটে আসছে জলোচ্ছ্বাসের মত। দূরে যে বৃষ্টি হয়েছে, এ

সেই পানি। পাহাড় থেকে ঢলের মত নেমে শুকনো ওয়াদির দুই কূল ছাপিয়ে ছুটে আসছে। আওয়াজ শুনে বুঝতে অসুবিধে হয় না প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে কোথাও। এসে পড়ল বলে।

ক্যাব ডোর খোলাই ছিল, হাত বাড়িয়ে খপ্ করে যূথীর বাহু চেপে ধরল রানা, একটানে বাইরে এনে ফেলল। 'ওপরে যান জলদি!' উন্মত্তের মত চেঁচিয়ে বলল। 'দৌড় দিন! ডন, নামুন তাড়াতাড়ি!' বুঝতে না পেরে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। তাই দেখে ক্ষিপ্ত গলায় দাবড়ি লাগাল ও, 'তাড়াতাড়ি যান, ফ্লাড আসছে!'

তবু কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল দু'জনে, কিন্তু যখন দেখল মেজরসহ অন্যরা খুব ব্যস্ত হয়ে গাড়ি খালি করতে লেগেছে, তখন টনক নড়ল। খিঁচে দৌড় লাগাল। ওরাও শুনতে পেয়েছে তখন পানির ভয়াবহ আওয়াজ।

'আমি চার্জ সেট করি,' ফয়েজ বলল শান্ত গলায়।

'জল্‌দি করো!' ড্যাশ বোর্ড লকার থেকে সাইফার, অবশিষ্ট রুট প্ল্যান-ম্যাপ ইত্যাদি বের করার ফাঁকে বলল রানা। বেশি নেই অবশ্য, ভাগে ভাগে রুট প্ল্যান করা ছিল থান্ডারবোল্টের। নির্দিষ্ট সেকশন পেরিয়ে আসার পর প্রতিবার সেই অংশের প্ল্যান-ম্যাপ ইত্যাদি পুড়িয়ে ফেলেছে ও।

খন্দকার জাহাঙ্গীর ততক্ষণে একগাদা বোঝা নিয়ে উঠতে শুরু করেছে তীর বেয়ে, হেকমত আলি তাকে সাহায্য করছে। কাগজপত্র পকেটে ভরে কারবাইনের কয়েক বাড়িতে রেডিও সেট গুঁড়িয়ে দিল রানা। ফয়েজ ফিউজ নিয়ে ব্যস্ত। আর সামান্য বাকি।

এই সময় ঘটল ব্যাপারটা।

ভেতর থেকে মুখ বের করেই আস্ত আহাম্মক হয়ে গেল রানা

পানির পাহাড় দেখে। আর মাত্র দশ পনেরো ফুট দূরে আছে–সামনের একটা বাঁক ঘুরে অবিশ্বাস্য গতিতে হুড়মুড় করে ছুটে আসছে। কম করেও দশ ফুট উঁচু, কাদাগোলা বাদামী, ঘন পানি। ওটা যে এত কাছে এসে পড়েছে, মেঘের ডাকের জন্যে বুঝতেই পারেনি।

হুঁশ হতে আতঙ্কিত গলায় চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'ফয়েজ, দৌড় দাও! সময় নেই, বাদ দাও!' বলেই সন্ত্রস্ত শেয়ালের মত ছুটল।

একই মুহূর্তে ফয়েজের কাজও শেষ হলো। 'আসছি,' বলে সোজা হলো সে। ওপর থেকে প্রত্যেকে চ্যাঁচাচ্ছে তার নাম ধরে। সদরউদ্দিনের ঘাড়ের সমস্ত খাটো চুল দাঁড়িয়ে গেছে ভয়ে, দু'পা নেমে এসে রানাকে ধরার জন্যে হাত বাড়িয়ে রেখেছে সে। ওদিকে বোঝা ফেলে জাহাঙ্গীর তারস্বরে ফয়েজকে ডাকছে, আতঙ্কে দু'চোখ কোটর ছেড়ে লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়বে যেন লোকটার।

কাজ হলো না। শেষ মুহূর্তে পা তুলেছিল ফয়েজ তীব্র আতঙ্কের ধাক্কা কাটিয়ে, কয়েক পা দৌড়েও এসেছিল, বিফলে গেল সব।

বাদামী রঙের ঘন, নিরেট দেয়ালটা বিদ্যুৎবেগে পিঙ্ক প্যান্থার টুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, পরমুহূর্তে করপোরাল ফয়েজ মোহাম্মদের ওপর। পাহাড় দেখার জন্যে মুখ ঘুরিয়েছিল সে, ঠিক তখনই। অসহায়, ভাঙাচোরা পুতুলের মত পানিতে ঘুরপাক্ খেল ফয়েজ, তলিয়ে গেল চোখের পলকে।

'ফয়ে-এ-জ!' চিৎকার করে উঠল জাহাঙ্গীর, কিন্তু পানির বিকট আওয়াজে চাপা পড়ে গেল সে ডাক।

ওদিকে প্রথম ধাক্কায় রানার হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল পানিতে, গতি থেমেই গিয়েছিল, আর এক সেকেন্ড দেরি হলে ও-ও ভেসে

যেত। কিন্তু সদরউদ্দিন সময় থাকতে ধরে ফেলায় অল্পের জন্যে বেঁচে গেল। ঘুরে পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকল রানা। কাত হয়ে ভেসে যেতে থাকা প্যান্থার টুকে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু করপোরালের কোন চিহ্নই নেই।

ওয়াদি বেড ভাসিয়ে-ডুবিয়ে ভয়াবহ শব্দের সাথে এক্সপ্রেস ট্রেনের গতিতে ছুটে যাচ্ছে পানি। কে তলায় পড়ল, কতজন তার জন্যে কষ্ট পাচ্ছে, সে সব দেখার সময় নেই।

একটু পর দূর থেকে চাপা, তবে জোরাল বিস্ফোরণের আওয়াজ এল। ধ্বংস হয়ে গেছে পিঙ্ক প্যান্থার টু। বিচ্ছিন্ন এক-আধটা টুকরো ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না ওটার হাজার খুঁজেও।

অমোঘ নিয়তি অসময়ে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ফয়েজকে, তবু তার ওপর দেশ ও জাতির ন্যস্ত দায়িত্ব আর কর্তব্য পালন করা থেকে তাকে সরিয়ে আনতে পারেনি।

মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে ওরা, কারও মুখে কথা নেই।

এতবড় একটা অঘটন সত্যিই ঘটে গেছে, একটু আগে পর্যন্ত যে মানুষটা দলের সব কিছুতে ছিল, সবার প্রতিমুহূর্তের সঙ্গী ছিল, চোখের পলকে নেই হয়ে গেল সে, বিশ্বাসই হতে চায় না কারও। এ কি করে হয়? এ-ও কি সম্ভব?

জাহাঙ্গীরের চোখ ছল্‌ছল্‌ করছে। হাবার মত ওয়াদির দিকে তাকিয়ে আছে সে। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল মাসুদ রানা, কিন্তু কি বলবে ভেবে না পেয়ে বুজে ফেলেছে। অসুস্থ লাগছে ওর। ফোঁপানি শুনে ঘুরে তাকাল—যূথী কাঁদছে।

জাফর, সদরউদ্দিন, হেকমত আলি, আলালউদ্দিন, সবাই যেন নির্বোধ রোবট একেকজন। স্রোতের দিকে অপলক তাকিয়ে

আছে—সবার চোখে অবিশ্বাস।

'চলো সবাই, কর্কশ গলায় হুকুম দিল রানা। 'গাড়িতে ওঠো।'

অদম্য দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঘুরে দাঁড়াল দলটা। সদরউদ্দিনকে মাঝখানে বসিয়ে রানা ও হেকমত আলি সামনে উঠল, অন্যরা পিছনে। রওনা হয়ে গেল পিঙ্ক প্যান্থার ওয়ান। চেহারায় কোন অভিব্যক্তি নেই হেকমতের, একদম পাথর হয়ে গেছে যেন। ওর মনের মধ্যে এক অশুভ চিন্তা ডালপালা ছড়াতে শুরু করেছে। মনে হচ্ছে, প্রথম সন্তানের মুখ দেখার সৌভাগ্য বোধহয় হবে না তার। হয়তো তার আগেই...

এদিকে রানাও একই কথা ভাবছে। পিছন পিছন শত্রুর তেড়ে আসার ব্যাপারটা যত ভুলে থাকতে চাইছে, ততই বেশি বেশি মনে পড়ছে। খারাপ চিন্তা আর ভয় ক্রমে বিস্তৃত হচ্ছে। একটার পর একটা সমস্যা যে ভাবে এসে হাজির হচ্ছে, তাতে মিশনের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে ওর মনে। প্রথমে শহীদ গেল, এবার ফয়েজ, এরপর আর কতজনকে হারাতে হয় কে জানে?

থান্ডারবোল্টে যারা আছে, তারা প্রত্যেকে একেকটা বহুমূল্যবান হিরের টুকরো। বছরের পর বছর ধরে এদের তিলে তিলে গড়ে তুলেছে বিসিআই। সামান্য অবহেলায় তার মধ্যে দু'জনের প্রাণ চলে গেল। সার্জেন্ট শহীদুল্লাহর ব্যাপার আলাদা, কিন্তু ফয়েজের মৃত্যুর দায়িত্ব এড়ায় কি করে মাসুদ রানা? ওয়াদির জলোচ্ছ্বাসের ভয়ঙ্করত্বের কথা ফয়েজ কেবল শুনেছে, কিন্তু রানা তো নিজের চোখে দেখেছে ওমানে, তুরস্কে। ও কেন আরও আগে সতর্ক হলো না? কেন নিজের আগে তার প্রাণের চিন্তা করল না?

কট্-কট্ শব্দে সচকিত হলো ও। চোখ তুলেই চমকে উঠল—সেই চিনুক! মাথা খানিকটা নিচু করে দ্রুত এগিয়ে আসছে।

দিনের আবছা, ফ্যাকাসে আলো ফুটেছে মাত্র, তাতে ওটাকে নরক থেকে আসা ভয়ঙ্কর অশুভ, নাম না জানা এক প্রাণসংহারী পতঙ্গের মত লাগছে।

'কপ্টার!' চেঁচিয়ে বলল ও। 'গাড়ি থামাও কোথাও, হেকমত!'

উপায় নেই দেখে গাড়ি ঘুরিয়ে দিল লোকটা, পথের পাশের গাছপালার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। তেমন লাভ হলো না, বেশিক্ষণ লুকিয়ে থাকা যাবে না এখানে। আপাতত কপ্টারের চোখের আড়ালে চলে আসা গেলেও ট্রুপাররা নেমে আসবে, অল্প সময়ের মধ্যেই খুঁজে বের করে ফেলবে। পাতার ফাঁক দিয়ে ওটাকে সৈন্য নামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়তে দেখল রানা। সঙ্গে সঙ্গে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল—উপায় নেই।

ম্যাপের অবশিষ্ট অংশে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল। 'গাড়ির মায়া ছেড়ে বাকি পথ হেঁটে যেতে হবে আমাদের।' সবাই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরে আবার বলল, 'সূর্য উঠবে এখনই, মেঘ থাকলেও আলো বাড়বে, এটা নিয়ে বেরই হওয়া যাবে না। কাজেই এটাকেও ধ্বংস করে ফেলতে হবে এখনই। দশ-পনেরো মাইল বেশি হাঁটতে হবে আর কি!' ডন আর যূথীকে দেখল ও। 'সরি, উপায় নেই।'

'দশ-পনেরো মাইল!' ঢোক গিলল ডন। 'এত পথ...'

'আরে ঘাবড়ান কেন?' বলল সদরউদ্দিন। 'এতবড় এক অ্যাডভেঞ্চারে মিয়া-বিবি বসেই তো থাকলেন, ছেলেপুলে হলে গল্প করবেন কি নিয়ে?'

হাসি চাপল রানা। অন্যরাও হাসি আড়াল করল, ডন-যূথীও। টনিকের মত কাজ করেছে করপোরালের মন্তব্য, বুকের ভার অনেক হালকা হয়ে গেছে সবার।

প্যান্থার পরিত্যাগের এক ফাঁকে যূথী জানতে চাইল, 'আপনার

কি মনে হয়, মেজর, ওরা আমাদের দেখতে পেয়েছে?'

'নিশ্চয়ই পেয়েছে। তবে এই লোকেশন এখনও স্পট করতে পারেনি খুব সম্ভব। তাহলে ট্রুপস্ নামাতে ব্যস্ত না হয়ে এগিয়ে আসত। ঘাবড়াবার কিছু নেই, এমনিতেও আমরা আমাদের জায়গামত প্রায় এসে পড়েছি।'

হেসে নিশ্চয়তা দিতে চাইল, কিন্তু কাজ হলো না তেমন। ওর সহকর্মীদের মধ্যেও না। স্বাভাবিক, মনে মনে ভাবল রানা, ফয়েজকে হারিয়ে সবার মনোবল কমে গেছে।

'ওকে,' আবার বলল ও। 'খুব জরুরী জিনিসপত্র ছাড়া কিছু সঙ্গে নেব না আমরা। যা যা নিতে হবে, সবাই ভাগ করে নিতে হবে। ডন-যূথী, আপনাদের কোন আপত্তি নেই নিশ্চই?'

হাসির ভঙ্গি করল সাংবাদিক। 'আপত্তি জানাবার সুযোগ আছে তাহলে?'

'নট রিয়েলি,' হাসল ও। 'স্পেয়ার ওয়াটার ক্যারিয়ারগুলো তুলে দিল তার হাতে। 'ব্যস্, এর বেশি চাপাব না।'

জাহাঙ্গীর জাফরকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার হাতের অবস্থা কি?'

'ভাল প্রশ্ন করেছ, ডাক্তারের খবর নেই তার রোগীর অবস্থার! কেন, খারাপ হলে ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে যাবে?'

চেহারায় বিষাদ ফুটিয়ে মাথা দোলাল জাহাঙ্গীর। 'না। ভাবছিলাম বেশি খারাপ হলে গুলি করে মেরে রেখে যাব।'

'ধন্যবাদ,' গম্ভীর হয়ে উঠল জাফর। 'কোনটারই দরকার হবে না। ম্যানেজ করে নেব।'

ছয়

পদযাত্রা শুরু হলো থান্ডারবোল্ট মিশনের। ততক্ষণে সূর্য বেশ খানিকটা উঠে পড়েছে, মেঘ ফুঁড়ে যদিও দেখা দেয়ার সুযোগ পায়নি এখনও। তবু এর মধ্যেই যথেষ্ট গরম হয়ে উঠেছে পরিবেশ।

সারারাত এত মেঘের আনাগোনা, এত মেঘ ডাকা, অথচ এদিকে বৃষ্টি হলো না এক ফোঁটাও। মেঘ এখনও আছে, তবে বৃষ্টির আশা ছেড়েই দিয়েছে রানা। হলে অবশ্য ভাল হত, খুব উপকার হত ওদের।

বন-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছে ওরা, মাথার ওপরে কপ্টারের চোখ থেকে গা ঢাকা দেয়ার মত আড়াল আছে, এমন জায়গা বেছে বেছে। মাটিতে পা ফেললে ছাপ পড়বে, তাই রোদের তাপে মরে শুকিয়ে যাওয়া ঝোপ আর ঘাসের গোছার ওপর দিয়ে ক্রল করে দলকে নিয়ে চলেছে রানা ও হেকমত আলি। স্লো লেপার্ড ক্রল বা চিতার বুকে হাঁটা বলে একে।

একটু এগোয়, আড়ালে বসে অস্ত্র তৈরি রেখে অপেক্ষা করে, তারপর আবার এগোয়। এতে কষ্ট যত না হচ্ছে, তারচেয়ে বহুগুণ বেশি চাপ পড়ছে স্নায়ুতে। করপোরাল সদরউদ্দিনের জিম্মায় আছে সাংবাদিক যুগল। কয়েক সেকেন্ড পর পর হুঁশিয়ার করছে সে

দু'জনকে, হাঁটু-কনুই জায়গা দেখে ফেলতে, পিঠ আর মাথা যতটা সম্ভব মাটির সাথে মিশিয়ে রেখে এগোতে বলছে।

ওদের চলার সময় সামনে রানা-হেকমত, পিছনে জাহাঙ্গীর-জাফর আড়ালে বসে পাহারা দেয় স্মোক গ্রেনেড নিয়ে। যদি চিনুক দেখে ফেলে, এগিয়ে আসার চেষ্টা করে, সবুজ ধোঁয়ায় চারদিক ঢেকে দেবে ওরা। অবশ্য পরিস্থিতি গুরুতর না হলে নয়। আলালউদ্দিন ওরফে টাইগার পিছনে আছে, প্রয়োজনে ফিন গ্রেনেড, অথবা হেকলার অ্যান্ড কচ ব্যবহার করবে সে পরিস্থিতি বুঝে। দায়িত্বটা সে নিজেই সেধে নিয়েছে।

ল্যান্ড রোভার ছেড়ে আসার আগে ওটায় প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ সেট করে এসেছে সে, নির্দিষ্ট সময়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে ওটা।

এক ঘণ্টায় মোটামুটি এগোল দল। কিন্তু তারপরই থেমে গেল রানা, চোখে দূরবীন লাগিয়ে সামনে, ডানে-বাঁয়ে তাকাচ্ছে ঘন ঘন। যুগলকে নিয়ে সদরউদ্দিন পৌঁছতে ঘুরে তাকাল, কপাল কুঁচকে আছে।

'কি সমস্যা, মাসুদ ভাই?'

'ট্রুপাররা সামনে থেকে ঘেরাও করে এগিয়ে আছে। কম্বিং করছে ওরা পুরো এলাকা। আর যাওয়া যাবে না।'

'তাহলে?'

'ওদের ফাঁকি দেয়ার এখন একটাই উপায় আছে, ধারেকাছে কোথায় আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যানাল শ্যাফট আছে, খুঁজে বের করে নেমে পড়া।'

'আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যানাল!' বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল সাংবাদিক। 'মানে কানাত?' ওকে সায় দিতে দেখে আবার বলল, 'আই সী! আমি তো জানতাম ও জিনিস ইরানীদের আবিষ্কার। শুধু ইরানেই আছে।'

'না। প্রাচীন মিশরীয়দের আবিষ্কার ওটা। সাড়ে চার হাজার বছর আগে ফারাওরা চালু করে। মিডল ইস্টের কয়েকটা দেশে আছে আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যানাল, এদেশে আছে কেবল সীমান্ত এলাকায়।'

ম্যাপে টোকা দিল ও। 'এখান থেকে শ'পাঁচেক গজ উত্তরে একটা ক্যানাল শ্যাফট আছে দেখানো হয়েছে এটায়। আরও কয়েকটা আছে, ওটা দিয়ে পুরো সাত মাইল দক্ষিণে যেতে পারব আমরা।'

'ওরে বাবা!' বলল যূথী। 'এত বড়?'

'এরচে' বড়ও আছে।'

পুরো একঘণ্টা লুকোচুরির পর সবচেয়ে কাছের শ্যাফটের মুখে পৌঁছল ওরা ভাগ ভাগ হয়ে। ইঁটের তৈরি গম্বুজ আছে ওটাকে ঘিরে, ওস্তাদ হাতের কাজ। ভেতরে যাওয়ার খিলানের মত মুখ খোলা দরজা আছে। দেখতে এস্কিমোদের বরফের ঘরের মত লাগে।

ভার্টিকেল ডাউন শ্যাফট যাতে ধসে না পড়ে, সে জন্যে ভেতরের দেয়াল ঘিরে দেয়া হয়েছে ইঁটের দেয়াল গেঁথে। কিনারায় হাঁটু গেড়ে বসে পানির কুলকুল আওয়াজ শুনল কিছুক্ষণ হেকমত আলি। তারপর যেন নিজেকে নিজে প্রশ্ন করল, 'একবারে শেষ গোসল হয়ে যাবে না তো?'

'এটা কত লম্বা বললেন, বস্?' জাহাঙ্গীর বলল।

'সাত মাইল। এটার সবচে' সুবিধে হলো আমরা যে পথে যেতে চাই, এটাও সেদিকে গেছে। পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে যে পথ পিছিয়ে এসেছি আমরা, তার ডবলেরও কিছু বেশি হবে।'

'তাহলে তো ভালই হলো।'

'হ্যাঁ,' বলে উঠল সাংবাদিক। 'যদি গভীরতা ছয় ফুটের ওপরে না হয়।'

মাথা দোলাল রানা। 'তেমন সম্ভাবনা মোটেই নেই। ইরানে কানাতে নেমেছি আমি, অনেকটা পথ হেঁটেছি, পানি হাঁটুর ওপর পর্যন্ত ওঠেনি কোথাও। এ দেশে এতদিন শুকনো মৌসুম ছিল, খুব সম্ভব কাল রাতেই প্রথম বৃষ্টি হয়েছে। যদি তাই হয়, তাহলে গোড়ালির সামান্য ওপর পর্যন্ত হতে পারে পানি, তার বেশি নয়।'

'হেঁটে না হয় গেলাম,' যূথী বলে উঠল। 'কিন্তু শেষ মাথায় গিয়ে যদি দেখি ওঠার পথ নেই?'

'পথ না থেকেই পারে না। কয়েকশো গজ পরপর শ্যাফট আছে, ভেতরের মাটি কেটে ওগুলো দিয়ে ওপরে তুলেছে ওরা। ভেতরের বাতাস যাতে আটকা থেকে বিষাক্ত না হয়ে ওঠে, বা ক্যানালের কোন সেকশন যে কোন সময় মেরামত, মেইনটেন্যান্স ইত্যাদির দরকার হয়ে পড়তে পারে, সে জন্যে ওগুলো সারাবছর খোলাই থাকে।'

'কোথাও অ্যাক্সিডেন্টলি বুজে গিয়েও তো থাকতে পারে,' ডন বলল।

মাথা ঝাঁকাল ও। 'তা পারে। তবে সেরকম কিছু ঘটলে চাষীরা সাথে সাথে মেরামত করে ফেলে। এসব দেশের মাটি শুকনো, তারওপর বছরের আট মাসই থাকে ড্রাই সীজন। ক্যানালের পানি ছাড়া চাষাবাদ করার উপায় নেই এদের। পানি চলার পথ বন্ধ থাকলে চলবে কেন?'

'বৃষ্টিতে ক্যানালের পানির গভীরতা বাড়ে?'

'হ্যাঁ। মাটি চুইয়ে পানি নামে ভেতরে।'

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল লোকটা। 'ওয়াদিতে যা ঘটে গেল...'

'সে পানি ছিল খোলা জায়গার, পাহাড়ী ঝরনার। সারাবছর খরচ না করলেও তো অত পানি হবে না ক্যানালে।' নাকের ডগা চুলকাল রানা। 'তবে রাতে যা ছিল, এখন তারচে' এক-দেড় ইঞ্চি বেশি হলেও হতে পারে।'

করপোরাল সদরউদ্দিন মাথা দোলাল চিন্তিত ভঙ্গিতে। লম্বা করে দম নিল। সবারই কোন না কোন ভীতি থাকে। উচ্চতা ভীতি, আরশোলা ভীতি বা মাকড়সা ভীতি এইসব–তার ভীতি হচ্ছে ড্রেন-টানেল ইত্যাদি। কমান্ডো ট্রেনিঙেও তা দূর হয়নি। রুটিনে যেদিন টানেল থাকত, চেহারা অন্যরকম হয়ে উঠত লোকটার। আজও সেই অবস্থা। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা।

কাজ শুরু করে দিলে অবশ্য ভয় কেটে যায়। খন্দকার জাহাঙ্গীরের হাজারবারের বেশি প্যারাসুট জাম্প করার রেকর্ড, অথচ এখনও জাম্প করার আগের রাতে ঘুমাতে পারে না সে। আবার সে-ই হিন্দুকুশে জাম্প করেছিল রানার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

পায়ের চাপা আওয়াজ শুনে ঘুরে তাকাল সবাই। আলালউদ্দিন আসছে হেলেদুলে। কাছের এক জঙ্গলে বসে ছিল আফগান ট্রুপারদের ওপর নজর রাখার জন্যে।

'ওরা কাছে এসে পড়েছে, বস্,' স্বাভাবিক গলায় বলল লোকটা। 'অবশ্য ধীরেসুস্থে এগোচ্ছে। খুব সতর্ক। এখন রওনা হলে হয়তো আধঘণ্টা বাড়তি সময় পাব আমরা।'

'এক কাজ করলে কেমন হয়?' রানাকে বুদ্ধি জোগাবার চেষ্টা করল সাংবাদিক। 'আমরা নিচে নেমে অপেক্ষা করতে পারি ওরা সার্চ করে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত, তারপর রাত হলে উঠে আসব! কি বলেন?'

'এই এলাকাতেই কোথাও আছি আমরা, তা ওরা জানে। হঠাৎ করে এত মানুষ উধাও হলো কি করে, প্রথমে না হলেও একটু

পরে ঠিকই বুঝে ফেলবে, লোক নামিয়ে খোঁজা শুরু করে দেবে সঙ্গে সঙ্গে।'

মুখ কালো হয়ে গেল তার। 'তাহলে আর নেমে লাভ হলো কি?'

'একটা লাভ আছে,' বলল ও। 'ওরা ব্যাপার টের পাওয়ার আগেই আমরা অনেক দূরে সুরে যেতে পারছি। যদি বুঝি যে ধাওয়া করা হচ্ছে, যে কোন এক শ্যাফট দিয়ে উঠে পড়ব। তবে সবচে' বড় কথা, ভেতরে সবাইকে শান্ত থাকতে হবে। কেউ আতঙ্কিত হয়ে পড়লে বিপদ।'

সাংবাদিক যুগলের দিকে তাকাল। 'আমরা সবাই কেভিঙে কমবেশি অভিজ্ঞ, কাজেই ভাববেন না আপনারা একেবারে আনাড়ীর হাতে পড়েছেন। যদি নির্দেশ মেনে চলেন, শেষ পর্যন্ত দেখবেন সহজেই মিটে গেছে সব।'

'যদি সামনে-পিছনে দুদিকেই মাটি ধসে পড়ে?' ভয়ে ভয়ে বলল যূথী। এতক্ষণ ছিল থিওরি, এখন হতে যাচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল, কাজেই মুখ শুকিয়ে গেছে।

'সে ভয় নেই,' জোর দিয়ে বলল রানা। মনে প্রাণে চাইছে বিশ্বাস করুক ওরা কথাটা। নইলে যে কোন মুহূর্তে যূথীর আশঙ্কা সত্যি হয়ে যেতে পারে। এইসব ক্যানাল কম করেও হাজার বছর আগের, ভেতরে নিশ্চই এক-আধটা দুর্বল পয়েন্ট আছে। তেমন কোথাও দাঁড়িয়ে যদি কেউ ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, এমনকি জোরে কথাও বলে, দেয়াল ধসে পড়লে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। 'তাহলে কি আমরা নামতাম?'

পাল্টা প্রশ্নটা মনে হলো দু'জনেরই পছন্দ হয়েছে। মাথা আস্তে কাত করে সায় দিল মেয়েটি।

'নিচে হাঁক-ডাক নয়, জোরে কথা নয়, অলরাইট?'

'অলরাইট,' একযোগে বলল স্বামী-স্ত্রী।

'আবার বলছি,' তর্জনী তুলল রানা। 'নার্ভ কন্ট্রোলে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে মাথা ঠাণ্ডা রাখা। কাজেই শান্ত থাকবেন, কোনকিছুতেই ঘাবড়াবেন না। বিপদ সামলাতে আমরা আছি। আপনাদের বিপদ হলে আমাদেরও হবে, কিন্তু আমরা যে বিপদ পছন্দ করি না, এই ক'দিনে আপনারা নিশ্চয়ই তা টের পেয়েছেন! আরেকটা কথা, যদি দেখেন পানি বেশি মনে হচ্ছে, যে শ্যাফট কাছে পাবেন, তার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকবেন। হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই, আমরা সামনে-পিছনে দুদিকেই থাকব।'

জাফর আহমেদের দিকে ফিরল রানা। 'তুমি থাকছ সবার আগে। আমি থাকব তোমার পিছনে। পিছনের সবাইকে বেল্ট-অর্ডার করব আমরা, কাজেই যতদূর সম্ভব কম হতে হবে আমাদের বোঝা। নইলে টানেল যদি কোথাও বেশি সঙ্কীর্ণ হয়, আটকে যাব।'

'সে আবার কি?' বলে উঠল ডন। 'তেমন চান্স আছে...'

'আরে না!' বাধা দিল সদরউদ্দিন। 'ও তো একটা কথার কথা।' নিজের টানেল ভীতি দূর করার জন্যে তাড়াতাড়ি নেমে পড়তে চাইছে সে। যত তাড়াতাড়ি নামা যায়, তত লাভ তার।

তৈরি হয়ে টানেলে নেমে পড়ল আটজনের দলটা। সাংবাদিক যুগল বাদে সবার হাতে টর্চলাইট। পানি গোড়ালির সামান্য ওপরে দেখে ডন আর যূথী বেশ সন্তুষ্ট হলো। মৃদু ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তুলে চলতে শুরু করল সবাই। জাফর আগে আগে তার রাবারমোড়া টর্চলাইট জ্বেলে এগোচ্ছে। খিলানের মত প্রায় গোল টানেলের ছাদ ছয় ফুট উঁচু। নিচের থেকে ওপরে বেশি নজর রাখতে হচ্ছে সবাইকে, নইলে মাথা ঠুকে যেতে পারে।

দু'নম্বরে রয়েছে মাসুদ রানা, তারপর আলালউদ্দিন। জাহাঙ্গীর

আসছে তার পিছনে। তার কাঁধে বড় এক আঁটি তুঁত গাছের লম্বা, সোজা ডাল। নামার আগে ওগুলো কাছের বন থেকে কেটে এনেছে আলাল। ওর একটা আছে জাফরের হাতে। ওটা দিয়ে ক্যানালের মেঝে ঠুকে গর্ত আছে কি নেই দেখে তবে পা বাড়াচ্ছে।

ডালগুলো আনা হয়েছে ওপরে ওঠার সময় অ্যাঙ্গেল জয়েন্ট হিসেবে কাজে লাগানোর জন্যে। সরু শ্যাফটের দেয়ালে দু'মাথা ঢুকিয়ে ওর ওপর পা রেখে ওপরে উঠবে ওরা। জাহাঙ্গীরের পিছনে সাংবাদিক যুগল, রানা ও জাফরের বেল্ট-প্যাক টানতে হচ্ছে ওদের। তারপর সদরউদ্দিন ও হেকমত আলি। ওদের দুজনের হাতে হেকলার অ্যান্ড কচ রেডি, অনুসরণ করা হচ্ছে বোঝা গেলে কাজে লাগানো হবে।

ভেতরে দলটা যত এগোচ্ছে, পিছনের শ্যাফট দিয়ে আসা আলো ততই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। একসময় মিলিয়ে গেল তার শেষ চিহ্নও। টর্চলাইটের আলো ছাড়া কালির মত অন্ধকার এখন ভেতরে। এবড়োখেবড়ো দেয়ালে ওদের ক্যারিকেচারের মত ত্যাড়াবাঁকা ছায়া নাচছে।

পানি সামান্য বেড়েছে বলে শব্দ কম হচ্ছে এখন। হাঁটুর সামান্য নিচ পর্যন্ত এখন পানি। বয়ে চলেছে চাপা কুল্-কুল্ শব্দে। মাঝেমধ্যে এর-ওর বোঝা ঘষা খাচ্ছে দেয়ালে। এ ছাড়া আর কোন্ শব্দ নেই। বাতাস ভরে আছে মাটির গন্ধে। একটু একটু করে নামছে ওরা, ক্যানাল বেড ক্রমে ঢালু হতে হতে এগিয়েছে। অবশ্য ভাল করে খেয়াল না করলে বোঝা মুশকিল। ছাদের উচ্চতা সবখানে একইরকম। তাই দলের অর্ধেকের বেশি সদস্যকেই হাঁটতে হচ্ছে মাথা নিচু করে।

অসুবিধে হচ্ছে সে জন্যে, গতি আশা অনুযায়ী হচ্ছে না, তবে

তা নিয়ে অভিযোগ নেই কারও। কথা নেই কারও মুখে। নেই বলেই অদ্ভুত এক নিঃসঙ্গতা চেপে বসেছে প্রত্যেকের মধ্যে। মনে অজানা ভয়ের আশঙ্কা।

একটু পর দেখা গেল দু'দিক থেকে চেপে আসতে শুরু করেছে দেয়াল। চাপছে তো চাপছেই। হেকমত আর যূথী ছাড়া অন্যরা ঘাড়ের মধ্যে মাথা গুঁজে এগোচ্ছে, কাঁধ যথাসম্ভব সরু করে, তবু ঘষা লাগতে শুরু করেছে দেয়ালে। আধডজন টর্চ লাইট থেকে থেকে জ্বলছে, তবু অন্ধকার যেন কালির চাইতেও গাঢ় হয়ে উঠছে ক্রমে।

হঠাৎ সামনে থেকে কারও চাপা বিস্ময় ধ্বনি শোনা গেল, পরক্ষণে ডানা ঝাপ্টানোর ফড়-ফড় শব্দ গুহার এ-মাথা ও-মাথা প্রতিধ্বনি তুলে বেড়াল খানিক।

ঝপ্ করে মাথা নামিয়ে নিল যূথী। বুকের ধড়ফড়ানি কমতে বলল, 'মা গো! কি জিনিস ওটা?'

আঁতকে উঠে ওর পিছনের সদরউদ্দিনও বসে পড়তে যাচ্ছিল। ভেবেছে নিশ্চয়ই ভূগর্ভের কোন দানব বুঝি। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে মত পাল্টেছে ডানার আওয়াজে। 'ও কিছু নয়,' বলল সে। 'বাদুড়।'

'উফ্! আরেকটু হলে...' থেমে গেল মেয়েটি কথা অসমাপ্ত রেখে।

ছাদে আলো ধরল হেকমত আলি। 'ওই দেখুন,' বলে নিজেই চমকে উঠল। 'ওরে বাবা, এ যে দেখছি হাজার হাজার!'

দেখল মেয়েটি। সত্যিই তাই। হাজার হাজার ধূসর, ছোট্ট বাদুড়। সাধারণের চাইতে একটু বড় সাইজের প্রজাপতির মত।

'তালগাছ মার্কার বাদুড়ের ভয় দেখে ওরাও ভয় পেয়েছে,' হেসে উঠে খোঁচা লাগাল হেকমত। 'খুব ভীতু তো!'

দু'কান গরম হয়ে উঠল করপোরালের, বুঝে ফেলল কথাটা কাকে উদ্দেশ করে বলেছে সে। ব্যাটা নিশ্চয়ই তার চমকে ওঠা দেখে ফেলেছে। চাপা ধমক লাগাল। 'এই! জোরে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে না?'

যূথী তখনও দাঁড়িয়ে আছে। দু'হাতে মাথায়, চুলে বসা কাল্পনিক বাদুড় খুঁজছে। পিছন থেকে আলো জ্বেলে ওকে সাহায্য করল সদরউদ্দিন, তারপর ঘোষণা করল, 'কই, নেই তো দেখি!'

'ঠিক তো?' হাত থেমে গেল ওর।

'আরে বাবা হ্যাঁ, ঠিক! চলুন।'

টানা আধ ঘণ্টা চলার পর আবার দিনের আলোর দেখা পেল ওরা। প্রথম ওয়েল শ্যাফট দিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে সবার বুক থেকে একটা করে ভারী পাথর সরে গেল যেন। 'বাঁচলাম!' যূথী বলল বিড়বিড় করে।

আলো দেখে গতি কমিয়ে দিল রানা। সবাইকে নিঃশব্দে চলার নির্দেশ দিয়ে নজর ওপরে রেখে এগোল। একজন একজন করে শ্যাফট পেরিয়ে গেল দলটা, কোন বাধা এল না। ওটার কাছের দেয়ালে এক ছোট গর্ত দেখে আলো জ্বেলে উঁকি দিল হেকমত আলি। ভেতরে নিজের বাসায় ডিমে তা দিচ্ছিল এক খঞ্জনা, ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল মানুষের সাড়া পেয়ে।

দেখতে দেখতে পিছিয়ে গেল টানেল, আবার গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করল ওদের। ক্ষণিকের স্বস্তি উবে গেল। পানির গভীরতা এরপর থেকে দেখা গেল বেশ দ্রুত বাড়ছে, কয়েক মিনিটের মধ্যে কোমর পর্যন্ত উঠে এল সবার, যূথীর বুক পর্যন্ত। এক এক করে আরও চার-পাঁচটা শ্যাফট অতিক্রম করল ওরা, তবে পরের কয়েকটায় অন্যগুলোর মত আলোর জোর ছিল না। বেশ ওপরে ওগুলোর মুখ, পাহাড়ে। প্রতিটা আগেরটার চাইতে আরও, আরও

উঁচুতে। ক্ষীণ যে আলো আসে, তাতে আঁধার সামান্য ফিকে হয় কেবল, দূর হয় না। প্রতি পদক্ষেপে পাহাড়ের আরও গভীরে ঢুকে পড়ছে ওরা।

আরও এক ঘণ্টা পর প্রথম সত্যিকারের বাধা দেখা দিল দলের সামনে। পানি আরও বেড়েছে এরমধ্যে। কথা নেই-বার্তা নেই, হঠাৎ সিলিং ঝপ্ করে পানির নিচে নেমে গেছে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল জাফর। চেহারা বিকৃত করে পা বাড়াল, কিন্তু মেঝের খোঁজ পেল না। লোকটা বেসামাল হয়ে পড়ছে দেখে থাবা দিয়ে তার কলার চেপে ধরে ঠেকাল রানা।

'সাবধান। বুঝে হাঁটো।'

'এবার মনে হয় পাতালে যেতে হবে, বস্।'

দু'জনে মিলে পরীক্ষা করে দেখল টানেল কম করেও ফুট তিনেক পানির নিচে তলিয়ে আছে, ডুব দিয়ে এগোনো ছাড়া উপায় নেই। তাই করতে হলো। প্রচুর সময় আর এনার্জি নষ্ট হলো সবার। সময় নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ল মাসুদ রানা। এমনিতেই পিছিয়ে পড়েছে দল, তার ওপর এত সমস্যা, কতক্ষণে গন্তব্যে পৌঁছবে কে জানে!

ভেজা কাপড়ের অস্বস্তিকর অনুভূতি ভুলে থাকার চেষ্টা করে আবার পা চালাল ওরা। পরের শ্যাফট নিরাপদে অতিক্রম করল সারির মাথা, তার পরেরটায় ঘটল বিপদটা। হেকমত আলি বিপদের সূত্র প্রথম দেখল।

একটা মাথা উঁকি দিচ্ছে, শ্যাফটের রিমের ওপর শুয়ে পড়ে তাকিয়ে আছে নিচে। রিম এত ওপরে যে ওটা এখানকার গ্রাম্য শিশু-কিশোরের মাথা না ট্রুপারদের কারও, বোঝা গেল না। বাচ্চাদের খেলার অংশ, না শিকারের, তাও না। তবে নিশ্চিত হতে বেশি দেরি লাগল না, আচমকা একটা হাত ভেতরে ঢিলের মত

কিছু ফেলতেই যা বোঝার বুঝে নিল।

'গ্রেনেড!' চেঁচিয়ে উঠল সে আতঙ্কিত গলায়, পরমুহূর্তে পিছন থেকে জোর এক ধাক্কা মেরে সদরউদ্দিনকে সামনে ঠেলে দিয়ে নিজেও লাফ দিল। কিন্তু পানি গভীর বলে দুই কদমের বেশি এগোতে পারল না। পিছনে থ্যাপ্ থ্যাপ্ আওয়াজ উঠল দু'বার, নামার পথে শ্যাফটের দেয়ালে বাউন্স করেছে গ্রেনেড, তারপরই ভীষণভাবে দুলে উঠল পৃথিবী।

বদ্ধ জায়গায় বিস্ফোরণের আওয়াজে কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার জোগাড় হলো সবার, শকওয়েভের ধাক্কায় স্থানচ্যুত বাতাস পিছন থেকে নিরেট দেয়ালের মত আছড়ে পড়ল ওদের পিঠের ওপর। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সবাই। ধোঁয়া, পাথুরে মাটির টুকরো আর শ্রাপনেল উড়ে বেড়াতে থাকল অন্ধকার টানেলে।

ধাতব কিছু একটা ছুটে এসে আছড়ে পড়ল হেকমতের ডান হাঁটুর পিছনে, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে। ওদিকে অনেক কষ্টে ধাক্কা সামলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে সদরউদ্দিন, পিছনে টানেল রুফ টুকরো টুকরো হয়ে বৃষ্টির মত ঝরে পড়ছে দেখে চোখ কপালে তুলে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ হুঁশ হতে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে হেকমতকে উদ্ধার করতে, ওর কলার মুঠো করে ধরে উন্মত্তের মত টানতে টানতে সামনের দিকে ছোটার চেষ্টা করল।

সারির মাথা তার আগেই বাঁক ঘুরে আড়ালে চলে গিয়েছিল, শকওয়েভের ধাক্কা সামলে ঘুরে পিছনদিকে দৌড়ে এল রানা অন্ধের মত। পুরু ধুলোর মেঘ আড়াল করে রেখেছে সব, আলো জ্বেলেও কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। মুখ ভরা ধুলো, দম নিতে পারছে না। মনে হচ্ছে এখনই বুক ফেটে মরে যাবে বুঝি। চোখের মধ্যে একগাদা বালি গিয়ে আরও সমস্যায় ফেলে দিল ওকে।

'তোমরা ঠিক আছ?' সামনের সবাইকে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে এল ও, চট্ করে একটা ডুব দিয়ে নজর মোটামুটি পরিষ্কার করে নিল। 'লেগেছে কারও?'

সাহায্য করার জন্যে যূথী ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, সরিয়ে দিল রানা। আবার প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, এই সময় সামনের কোথাও থেকে আরেক গুরুগম্ভীর গর্জন ভেসে এল। থর থর করে কেঁপে উঠল টানেল, ছাদ খসে খসে পড়তে লাগল।

ধুলো গলায় ঢুকে পড়ায় খক্ খক্ করে কেশে উঠল সাংবাদিক, বিস্ফারিত চোখ কোটর ছেড়ে লাফিয়ে পড়ার জোগাড়। 'আবার গ্রেনেড!'

উত্তর দিল না কেউ, ধুলোর মেঘের মধ্যে থেকে রানাকে বের হতে দেখে সন্ত্রস্ত সদরউদ্দিন বলে উঠল, 'ওরা আমাদের জ্যান্ত কবর দিতে চাইছে, মাসুদ ভাই!' নিজের একমাত্র ফোবিয়ার মুখোমুখি হয়ে আত্মা উড়ে গেছে লোকটার। সব ফেলে ঝেড়ে দৌড় দেয়ার ইচ্ছে অনেক কষ্টে দমিয়ে রেখেছে।

'কেউ চোট পেয়েছ?' তার মন্তব্য না শোনার ভান করল ও।

'হে-হেকমত আলি পেয়েছে,' জবাব দিল যূথী। লোকটার আরেক হাত ধরে রেখেছে সে। 'সামনের অবস্থা কি?'

'জানি না' বলতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু মুখ খুলেও থেমে গেল শেষ মুহূর্তে। কারণ না দেখলেও বুঝতে পারছে সামনে কি ঘটেছে। মাটি ধসে টানেল বুজে গেছে। পানি চলছে না, স্থির হয়ে আছে। দুই দেয়াল আর ছাদের মাটি খসে পড়ায় টানেল অনেক প্রশস্ত হয়ে গেছে। পুরু ধুলো জমে আছে সারফেসে। গলে কাদা হয়ে যাচ্ছে দ্রুত।

ওদিকে হেকমত আলি জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে দুর্বলতা দূর করার চেষ্টা করছে। কম করেও এক গ্যালন পানি খেয়ে

সাত

অনেক রাত। আরব ও ওমান উপসাগরের মাঝামাঝি গভীর সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় চড়ে নাচতে নাচতে চলছে বিএনএস আলমগীর। প্রকাণ্ড একেকটা ঢেউ, খোলের গায়ে বাড়ি খেয়ে সজোরে দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, পানি ছিটকে উঠে ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে পুরো ডেক। কোথাও কোন আলো নেই, মিশমিশে কালো আঁধারের চাদর মুড়ি দিয়ে ইরান-পাকিস্তান বর্ডারের দিকে নয় নট গতিতে ছুটে চলেছে ওটা।

হুইল হাউসে রাডার স্ক্রীনের গাঢ় সবুজ আলোয় চারটা ছায়ামূর্তি দেখা যাচ্ছে। মাঝবয়সী, অভিজ্ঞ কমান্ডার রেজাউল হক, থ্যান্ডারবোল্টের সাহায্যকারী, স্ট্যান্ড-বাই টীমের ক্যাপ্টেন কামাল ও সার্জেন্ট হুমায়ুন কবির এবং রাডার অপারেটরের। শেষেরজন বাদে আর সবার নজর সামনে সেঁটে আছে। একটু আগে একটা ইরানী টহল বোটের অবস্থান ধরা পড়েছে রাডারে, ওটা এদিকেই আসে কি না দেখার চেষ্টা করছে।

রেজাউল হকের অবশ্য তা নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা নেই। একদম স্বাভাবিক সে, আচরণ দেখে মনেই হয় না দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে আছে, অন্য দেশের পানি সীমায়, চোখে পড়ে গেলে জবাবদিহি করতে হতে পারে। বরং যেন ফয়েজ লেকে নৌকা বেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমন ভাব তার।

এর অবশ্য কারণও আছে। কয়েক মাস আগে সুইডেন থেকে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর তৈরি করিয়ে আনা বিশেষ দুই রণতরীর একটা বিএনএস আলমগীর। সবদিক থেকেই স্পেশাল। নিতান্ত গোবেচারা চেহারা। ওপরে ছেঁড়াখোঁড়া ত্রিপল টাঙানোর বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ওসব টাঙালে হতচ্ছাড়া চেহারার ফিশিং বোট ছাড়া ওটাকে অন্য কিছু মনে হবে না। কেউ ধারণাই করতে পারবে না আলমগীরের হর্সপাওয়ার যে কোন অত্যাধুনিক রণতরীর সমান, এবং তার এক্সোসেট শিপ-টু-শিপ মিজাইলের বিধ্বংসী ক্ষমতা অবিশ্বাস্য।

প্রয়োজন নেই, তাই ধীরগতিতে এগোচ্ছে আলমগীর। পাকিস্তান বা ইরান, কারও টহল বোট যদি টের পায় তার উপস্থিতি, মাছ ধরার ট্রলার ছাড়া কিছু ভাবার কথা মনে ঠাঁই দেবে না। এই এলাকায় ফিশিং বোটের জন্যে নয় নট সর্বোচ্চ গতি। কাজেই দূর থেকে কেউ মিজাইল ছোঁড়ার আগে ব্যাপারটা অবশ্যই

বিবেচনা করে দেখবে। তাই এত নিশ্চিন্ত সে।

'আবহাওয়ার কি অবস্থা?' প্রশ্ন করল কামাল।

'এমনিতে ভাল না, তবে আপনাদের জন্যে ভাল,' জবাব দিল কমান্ডার হক। 'গ্লাস কেবলই নামছে। কাল দুপুরের মধ্যে মেঘে ঢেকে যাবে আকাশ, রাতে ঝড়বৃষ্টি হবে।'

মাথা দোলাল কামাল। খারাপ ওয়েদার ওদের জন্যে বোনাস পাওনা হবে। বাকি কাজ নির্বিঘ্নে সারা যাবে। 'আর কত সময় আছে?'

'আধ ঘণ্টা। আধঘণ্টা পর পাক-ইরান কোস্টাল রাডার রেঞ্জের কাছাকাছি পৌঁছব আমরা।'

'আমরা তাহলে বাকি কাজ সেরে ফেলি গিয়ে।'

'হ্যাঁ। তৈরি হয়ে গ্যালিতে আসুন, আপনাদের জন্যে ফেয়ারওয়েল পার্টির ব্যবস্থা করা হয়েছে ওখানে।'

হেসে মাথা ঝাঁকাল সে। 'আচ্ছা।' হুইল হাউস থেকে বেরিয়ে দ্রুত এগোল আফটার ডেকের দিকে। সার্জেন্ট কবির নীরবে অনুসরণ করছে তাকে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে অনিশ্চিত অভিযানে যেতে হবে, চিন্তাটা রক্ত গরম করে তুলেছে দু'জনেরই।

উপকূলের ষাট মাইল দূরে ওদের নামিয়ে দেবে বিএনএস আলমগীর, ওখান থেকে দুটো রিজিড রেইডার অ্যাসল্ট ক্র্যাফটে চড়ে পাকিস্তানের গদার যাবে ওরা 'সাইট সীয়িঙে'। ঢেউয়ের জন্যে সময় কিছু বেশি লাগবে, তবে দু'ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে ওরা, তাতে অসুবিধে হবে না। গদার মোটামুটি নামকরা ট্যুরিস্ট স্পট। সময়টা ট্যুরিজমের উপযুক্ত নয় অবশ্য, কিন্তু তাতে কি? কূটনীতিকরা যদি অসময়ে ট্যুরে যেতে চায়, কে বাধা দিতে যাবে?

গতকালই চার বাংলাদেশী কূটনীতিক গদার এসেছে। ওখান থেকে চাগাল পাহাড় দেখতে যাবে আরও কয়েকটা দর্শনীয় স্পট

ঘুরে। যাবে ঠিকই, তবে তারা নয়, এরা। রাতের আঁধারে অদল-বদল হবে দলটা, 'কূটনীতিকরা' গভীর রাতে মোটেল ছেড়ে বের হবে পরের গন্তব্যে যাওয়ার জন্যে। সেটা হচ্ছে সী বীচ। অ্যাসল্ট ক্র্যাফটে চড়ে আলমগীরে এসে উঠবে তারা, 'অপারেশন উদ্ধারের' চার সদস্য যাবে তাদের পথে।

কাগজপত্রসহ সমস্ত আয়োজন করা আছে, কোন অসুবিধে নেই। অসুবিধে হলে হবে গার্ডপোস্ট অফিশিয়ালদের। কাল গদার এল এক চেহারার চার কূটনীতিক, আজ ফিরে যাচ্ছে অন্য চেহারার চারজন, অথচ কাগজপত্র একই আছে, এই নিয়ে হয়তো সামান্য দ্বিধায় পড়তে পারে ওরা। এর বেশি কিছু ঘটার কোন চান্সই নেই—'কূটনীতিক' বলে কথা।

সন্দেহ হলেও ওপরের মহলে জানাতে পারবে না কেউ, তাহলে হয়তো বিরক্তির সাথে চোখের ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেয়া হতে পারে।

প্রস্তুতি, সংক্ষিপ্ত পার্টি এবং বিদায়পর্ব সেরে দোদুল্যমান দুই লো-প্রোফাইল গ্লাস ফাইবার ক্র্যাফটে উঠে বসল দল ভাগ ভাগ হয়ে। সঙ্গে বিএনএস আলমগীরের দুই নাবিক, এদের পৌঁছে দিয়ে অপেক্ষমাণ দলটাকে ফিরিয়ে আনবে তারা। স্টার্ট নিল দুই শক্তিশালী ৪০ হর্সপাওয়ারের এভিনরুড এঞ্জিন, কালো রাবার স্যুট আর ইমেজ ইনটেন্সিফাইয়ার পরা চার সদস্যের দলটাকে নিয়ে মুহূর্তে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

একটায় আছে ক্যাপ্টেন কামাল ও করপোরাল আহসান হাবিব, অন্যটায় সার্জেন্ট হুমায়ুন কবির ও করপোরাল মইনুল হোসেন। রাত তখন ঠিক একটা।

আকাশে একটু আগেও প্রচুর তারা ছিল, এখন নেই। তার মানে মেঘ জমতে আরম্ভ করেছে। ভাল, মনে মনে বলল ক্যাপ্টেন

কামাল। ঝড়-বৃষ্টি যত তাড়াতাড়ি শুরু হয়, যত বেশি সময় চলে, ততই সুবিধে।

হেকমত আলির দিকে এগোল মাসুদ রানা। টর্চের আলোয় তার ক্ষত দেখে আঘাত বোঝার চেষ্টা করল। 'কি অবস্থা?' প্রশ্নটা জাহাঙ্গীরকে করল। 'মারাত্মক নয় তো?'

মাথা দোলাল সে। 'জ্বি না। এক টুকরো শ্রাপনেল ঢুকেছে। কিন্তু এখানে বসে কিছু করার উপায় নেই।'

'জাফর, সদরউদ্দিন, সামনে যাও। মাটি সরিয়ে বের হওয়ার রাস্তা করো। তাড়াতাড়ি বেরুতে হতে হবে, পানি বেড়ে যাচ্ছে।'

সবাই খেয়াল করল ব্যাপারটা—সত্যি তাই। সামনের দেয়ালে বাধা পেয়ে কিছু সময়ের জন্যে থমকে গিয়েছিল পানি, তারপর পিছিয়ে এসে সমান হয়েছে। কম করেও চার ইঞ্চি বেড়ে গেছে দেখতে দেখতে।

ওদের চলে যেতে দেখল যূথী, তারপর রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে চেহারায় রানার দিকে ফিরল। 'বেরুতে পারব আমরা?'

'নিশ্চয়ই!' জোর দিয়ে বলল ও, যদিও চেহারা বলল অন্য কিছু। দুশ্চিন্তার মেঘে ছেয়ে আছে। খেয়াল করেছে, এরইমধ্যে ভেতরের বাতাস বেশ ভারী হয়ে উঠেছে। আগের মত সহজে দম নিতে পারছে না। 'চলুন, সামনে যাই। ওদের খোঁড়া মাটি সরাতে সাহায্য করতে হবে।'

ওদিকে সঙ্গের এনট্রেঞ্চিং যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজে লেগে পড়েছে জাহাঙ্গীর। জায়গা অল্প বলে সদরউদ্দিন একটু পিছনে দাঁড়িয়ে আছে, নরম মাটি সরিয়ে পথ তৈরিতে সাহায্য করছে তাকে। মিনিট দশেকের মধ্যে ফুট দেড়েক ডায়ার গর্ত তৈরি হয়ে গেল, একজন মানুষের জন্যে যথেষ্ট। ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকতে শুরু করল

ভেতরে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল সবার।

টর্চলাইট জ্বেলে গর্ত দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে দিল জাহাঙ্গীর, এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল পরিস্থিতি বোঝার জন্যে।

'কেমন দেখছ?' অধৈর্য গলায় বলল সদরউদ্দিন। তার ভয় হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে গোটা টানেলই হয়তো ধসে পড়বে।

'টানেল শ্যাফট নয়,' বিড়বিড় করে জবাব দিল সে। 'দু'দিকের দেয়াল কোলাপস করেছে এদিকে...মনে হচ্ছে। বাই-পাস গোছের...হ্যাঁ, তাই। তবে চিন্তার কিছু নেই, যাওয়া যাবে। অবশ্য দেয়ালের অবস্থা সুবিধের নয়, আরেকটা ডিম পড়লে সবার কবর হয়ে যেতে পারে।'

'দেখি, আমাকে দেখতে দাও,' বলল মাসুদ রানা। জাহাঙ্গীর সরে দাঁড়াতে উঁকি দিল। 'চলবে। তবে শব্দ করা যাবে না, আস্তে ধীরে যেতে হবে।'

বেশ সময় লাগল ওদের বেরিয়ে আসতে। কাদা মেখে ভূত হয়ে আবার এগোল সবাই। হেকমত আলি আলালউদ্দিনের কাঁধে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। পিছিয়ে পড়ছে ওরা। খানিকটা যেতে ধসে পড়া মাটির উঁচু এক ঢিপি জেগে আছে দেখে থেমে জাহাঙ্গীরের দিকে তাকাল রানা। 'এখানে বসে ওর ইনজুরি চেক্ করে নাও।'

তাই করল সে। আলো জ্বেলে মিনিট দুয়েক ক্ষতস্থান দেখে মাথা দোলাল। 'একটা শিরা ছিঁড়ে গেছে মনে হয়। স্টীল ফ্র্যাগমেন্ট ভেতরে রয়ে গেছে, তবে ভয়ের কিছু নেই। হাসল ঠোঁট টিপে। 'ওর বউকে শর্ট কোর্স নার্সিং শিখে রাখার জন্যে মেসেজ পাঠালে ভাল হত, বস্। ও প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারলে কাজে লাগত।

'এই ব্যাটা, হাতুড়ে!' খেঁকিয়ে উঠল হেকমত। 'বকবক বন্ধ

করে কাজে হাত লাগাও দয়া করে।' সদরউদ্দিনের দিকে ফিরল। 'ঠিক সময় মত আমাকে সরিয়ে আনার জন্যে ধন্যবাদ, মেট। নইলে মাটি চাপা পড়ে মরতে হত আজ।'

বিব্রত দেখাল করপোরালকে। পাল্টা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু জাহাঙ্গীর ক্ষত বাঁধতে শুরু করে দেয়ায় থেমে গেল, ব্যথায় বিকৃত হয়ে উঠেছে ট্রুপারের চেহারা। দশ মিনিট পর সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল নার্স। 'চলবে আপাতত।'

ঝুঁকি অগ্রাহ্য করে সামনের দিকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রানা। এ ছাড়া উপায়ও নেই। পিছিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। থেমে থাকলেও বিপদ, আর দুয়েকটা গ্রেনেড যদি ফেলে ওরা, মাটি ধসে গোটা টানেল বুজে যেতে পারে। তাহলে তিনশো ফুট মাটির নিচে কবর হয়ে যাবে সবার।

মোটামুটি নিরাপদেই এগোল ওরা পথের কঠিন এক বাধা ছাড়া। টানেল এক জায়গায় একেবারে বন্ধ দেখে থমকে গিয়েছিল দল। সামনে পথ একেবারেই নেই। খুঁজেপেতে সারফেসের দু'ফুট নিচে ওটাকে আবিষ্কার করল আলালউদ্দিন। আগে নিশ্চই কখনও ধস নেমেছিল এখানটায়, টানেল বুজে গিয়েছিল, পরে ঠিকমত মেরামত করা হয়নি। দেড় ফুটের মত চওড়া পথ ওখানে।

সে-ই নেতৃত্ব দিল। কোমরে দড়ি বেঁধে পুরো এক মিনিট ডুব সাঁতার দিয়ে ওপারে পৌঁছল, তারপর এক এক করে অন্যরা। যূথীর বেলায় বেশ সমস্যা দেখা দিয়েছিল, কিছুতেই ডুব দেবে না ও। দিলেই মরে যাবে বলে ভয় পাচ্ছিল। সময় নষ্ট হচ্ছে দেখে কঠোর হলো রানা, একটানে ওকে পানির নিচে এনে ঠেলে পাঠিয়ে দিল গর্তের মধ্যে। বাকিটা সেরেছে ওপাশে দড়ি ধরে থাকা সদরউদ্দিন, টেনে নিয়ে গেছে। সবার শেষে এল রানা।

'সবাই চুপ!' চাপা গলায় সতর্ক করল ও। 'সামনের টানেল

শ্যাফটে লোক থাকতে পারে, সামান্য আওয়াজও শুনে ফেলতে পারে। কোন শব্দ নয়। সাপের কামড় খেলেও কেউ চ্যাঁচাবে না, হজম করে নেবে।'

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল সবাই। টেনশন বাড়তে লাগল। সামনে আলোর আভাস দেখে এক পা এক পা করে এগোল দল, এবার রানা ও আলাল থাকল আগে। শ্যাফটের নিচে পৌঁছে সাবধানে উঁকি দিল ওরা। কম করেও তিনশো ফুট দীর্ঘ হবে ওটা, রানা অনুমান করল। বেশ সরু। আধুলি সাইজের নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে ওপরে। তার মানে মেঘ কেটে গেছে।

এক মিনিট নিচু গলায় কথা বলল রানা সঙ্গীদের সাথে, দুয়েকটা নির্দেশ দিল, তারপর তৈরি হয়ে নিল। সদরউদ্দিনের কাঁধে ভর রেখে শ্যাফটে মাথা গলিয়ে দিল, দেয়ালের দু'দিকে উপযুক্ত জায়গা দেখে পা বাধিয়ে দক্ষতার সাথে উঠে যেতে লাগল এক ফুট-দু'ফুট করে।

কিছুদূর উঠে থামে, ওর কোমরে বাঁধা ইন্টারলিঙ্কড্ টগল রোপের সাথে নিচ থেকে নতুন অংশ জুড়ে দেয় আলাল তুঁত গাছের কয়েকটা করে অ্যাঙ্গেল জয়েন্টসহ, ওগুলো তুলে দেয়ালে গেঁথে পা রাখার হোল্ড তৈরি করে রানা, তারপর আবার ওঠে। ডালগুলো পালা করে বয়ে আনতে ভীষণ কষ্ট হয়েছে প্রায় সবার, এখন তা কাজে লাগছে। টানেল বেয়ে ওঠার চমৎকার নিরাপদ রাস্তা তৈরি হচ্ছে ওগুলো দিয়ে। যে কোন অনভিজ্ঞ ক্লাইম্বারও এখন উঠে যেতে পারবে অনায়াসে।

শেষের দিকে আগের তুলনায় বহুগুণ সতর্ক হলো ও। আর মাত্র বিশ ফুট উঠলেই হলো। মাথার ওপরে ঝকঝক করছে আকাশ। অন্ধকার থেকে উঠে আসায় এত আলো সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠেছিল প্রথমদিকে, এখন অবশ্য চোখ সয়ে গেছে। ওপরের পরিস্থিতি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে এখন রানা। দাঁতের ফাঁকে কামড়ে

ধরে আছে কমান্ডো ছুরি।

ওপরে কি শ্যাফটের পাহারায় আছে আফগান ট্রুপাররা? ভাবছে ও, কতজন? কি করছে ব্যাটারা, ঝিমাচ্ছে? নইলে এতক্ষণ হয়ে গেল একবারও উঁকি দিল না কেন? নাকি নেই কেউ? ঠিক তখনই নাকে গন্ধটা পৌঁছল। ঘামের গন্ধ! বেশ প্রকট। তারমানে কাছেপিঠেই আছে ব্যাটারা। আসন্ন ভবিষ্যতের কথা ভেবে উত্তেজিত হয়ে উঠল ও, ভয়ের শীতল একটা ধারা বয়ে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে।

আরও সাবধানে, প্রচুর সময় নিয়ে পরের অ্যাঙ্গেল জয়েন্ট সেট করল রানা, তার ওপর উঠে দাঁড়াল নিঃশব্দে। এতক্ষণ যখন উঁকি দিস্‌নি, ভাইয়েরা, মনে মনে বলল, আরেকটু ধৈর্য ধরে থাক্। এখন ওসব করলে আমি বিপদে পড়ে যাব। আর কয়েক মিনিট আরাম কর।

হঠাৎ খেয়াল হলো, ওরা চাষীও তো হতে পারে। কাজের ফাঁকে বিশ্রাম নিচ্ছে! তাই হবে, প্রায় নিশ্চিত হলো রানা, নিশ্চয়ই তাই। ট্রুপার হলে এতক্ষণ হয়ে গেল অথচ গলা বাড়িয়ে ভেতরটা একবার দেখল না পর্যন্ত, এ কেমন কথা? পুরো নিশ্চিত হতে যাচ্ছিল রানা, এমনসময় ওর আস্থার গালে কষে এক চড় মারল বাতাস। সস্তা সিগারেটের সাথে আরও একটা বিশেষ গন্ধ এল নাকে, সেটা গ্রাফাইট তেলের। গান অয়েল!

একদম তাজা গন্ধ। তার মানে খুব সম্প্রতি অয়েলিং করা হয়েছে ওটায়, নাকি ওগুলোয়? পরেরটা, আপনমনে বলল রানা চাপা হাসির শব্দ শুনে। অন্তত দু'জন আছে ব্যাটারা। একজন হলে হাসত না। পরের ধাপে উঠল ও, দেহের পেশী টানটান হয়ে উঠছে ক্রমে। আরও উঠল। পৌঁছে গেল শ্যাফটের কিনারায়। এখন সোজা হয়ে দাঁড়ালেই বাইরে দেখতে পাবে।

মাথায় পেঁচিয়ে বাঁধা ক্যামোফ্লেজড্ ব্যানডানা ঠিক করে নিল রানা, এক চুল এক চুল করে উঁচু হলো। মাথা পিছনে ঝুলিয়ে রেখে আগে নাক জাগাল। চারদিকে এক পলক নজর বুলিয়েই সঙ্গে সঙ্গে ডুব দিল। স্থির হয়ে মনের চোখে কি ধরা পড়েছে তাই ভাবতে লাগল।

চোখ ধাঁধানো আলো, উষর এক পাহাড়ী ঢাল, মাঝ দুপুরের উত্তাপের কাঁপা ধোঁয়া দেখেছে ও। শ্যাফটের মুখের একপাশে প্রকাণ্ড এক ববিন, ওটার আড়ার সাথে ছাগলের চামড়ার তৈরি বড় একটা ব্যাগও আছে। ক্যানাল থেকে কুয়োর মত পানি তোলা হয় ওটা দিয়ে। বাতাস প্রায় নেই। আকাশ নীলের তুলনায় সাদা বেশি। আর কি? ও হ্যাঁ, নিজের নাকের ডগা।

আবার মাথা তুলল ও, এবার এক ইঞ্চি বেশি। এবং দেখা পেল ওদের। দু'জন, এদিকে পিছন ফিরে বসে আছে। নজর নিচে, দূরের নদীর উপত্যকায়। ওদিকের কয়েকশো গজ দূরে আরেক শ্যাফট ওয়েল ঘিরে বেশ কিছু মানুষ ভিড় করে আছে। ওটা দিয়েই দ্বিতীয় গ্রেনেড ফেলা হয়েছিল। বেশ দূরে, তাছাড়া ওদিকে বেশ কিছু গাছ আছে বলে পরিষ্কার দেখা যায় না, তবে রানার মনে হলো ওই শ্যাফট দিয়ে লোক নামানো হয়েছে বিস্ফোরণের ফলাফল দেখতে। এরা সেদিকেই চেয়ে আছে।

আরেকটু উঠল রানা। ছুরি খাপে রেখে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল বের করল। তারপর শিকারি চিতার মত ওয়েল মুখের বাঁধানো পাথরের পাড় টপ্‌কে বাইরে চলে এল। এখন বুঝতে পারছে ব্যাটারা কেন এতক্ষণ নড়েনি। এরা ধরেই নিয়েছিল আগের শ্যাফট দিয়ে ছোঁড়া গ্রেনেডেই কাজ হয়ে গেছে, কাজেই এটায় নজর রেখে লাভ কি?

বসে এক পা এগোল ও, পরক্ষণে থেমে গেল, আঁতকে উঠল

মনে মনে। ওর চার হাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল ক্যামোফ্লেজড্ চামড়ার বড় এক গিরগিটি, শুকনো পাতার ওপর দিয়ে সরসর আওয়াজ তুলে দৌড়ে গেল ওকে দেখে। রানা ভাবছিল এখনই ঘুরে তাকাবে দুই ট্রুপার। কিন্তু না, গল্পে এত মগ্ন যে ব্যাপারটা খেয়ালই করেনি।

আবার এগোবার আগে সামনে, দুদিকে, ভাল করে দেখে নিল ও আর কিছু আছে কি না। নেই। ওয়ালথার তুলল ডানদিকের ট্রুপারের মাথা সই করে। দুপ্!

বুলেটের ধাক্কায় সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে। এমনভাবে পড়ল, মনে হলো কেউ লাথি মেরেছে মাথায়। আধ সেকেন্ডের জন্যে তার সঙ্গী ভাবল জ্ঞান হারিয়েছে বুঝি সে। হাত বাড়িয়ে গড়িয়ে পড়া দেহটা ধরতে যাচ্ছিল, পিছনদিকের চুরমার হওয়া খুলি দেখে আঁতকে উঠে থেমে গেল। ঘুরে তাকাল ঝট্ করে। আবার দুপ্।

এর ঠিক দুই চোখের মাঝখানে গিয়ে ঢুকল বুলেট, বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে যাচ্ছে মানুষটা। কিন্তু সেদিকে নজর দেয়ার সুযোগ হলো না রানার, একটা ক্যানকেনে আওয়াজ কানে আসতে এদিক-ওদিক তাকাল। চোখ পড়ল প্রথম গার্ডের শিথিল ডান হাতের দিকে। একটা ওয়াকি-টকি।

কেউ কথা বলছে ওটায়। এদের ডাকছে হয়তো। বিস্ফারিত চোখে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। সর্বনাশ! এখন কি হবে? কেউ যদি সাড়া না দেয়, নিশ্চয়ই ট্রুপার পাঠানো হবে এখানকার পরিস্থিতি দেখার জন্যে। সে ক্ষেত্রে অল্প সময়ের মধ্যে ফাঁস হয়ে যাবে ঘটনা, হয়তো নিচের ওরা সবাই উঠে আসার চান্সও পাবে না। কি করা যায়? ও কথা বলবে?

কিন্তু কি বলবে? যদি কোন পাসওয়ার্ড থেকে থাকে, পয়লা

চোটেই তো ধরা পড়ে যাবে, তখন? ওদিকে বক্তা চিৎকার করতে শুরু করেছে তখন ওটায়। উপায় নেই দেখে জিনিসটা তুলে নিল রানা, কথা না বলে খক্ খক্ করে কেশে উঠল। পরমুহূর্তে চোখমুখ কোঁচকাল মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ারের মত জঘন্য গালাগালির তুবড়ি শুনে। প্রত্যেকটাই ছাপার অযোগ্য গাল। দুনিয়ার নোংরা।

'...কে রে তুই? নাম্বার কত?' স্টক ফুরিয়ে যেতে প্রশ্ন করল মোটা গলার কলার।

আসল জবাব এড়িয়ে মিনমিনে গলায় রানা বলল, 'পেচ্ছাপ করতে গিয়েছিলাম, স্যার। দুঃখিত...'

'একসঙ্গে দুটোকেই মুতে ধরেছিল নাকি, হারামজাদারা!' খেঁকিয়ে উঠল মানুষটা। 'আরেকটা কোথায়?'

'স্যার, ও-ও পেচ্ছাপ...'

'উহ্! কী যন্ত্রণায় যে পড়েছি শুয়োরের পাল নিয়ে!' কিছু সময় কথা নেই। 'খবর কি তোমাদের শ্যাফটের?'

'কোন খবর নেই, স্যার। কারও দেখা নেই। মনে হয় গ্রেনেডে মরেছে সব।'

'কিছুই হয়নি ওদের,' বেশ কিছুক্ষণ পর থমথমে গলায় বলল লোকটা। 'একটা লাশও পাইনি আমরা এদিকে।' আবার বিরতি। 'কড়া নজর রাখো। টানেল দিয়ে লোক যাচ্ছে। ভেতরে থেকে থাকলে তাড়া খেয়ে পালাবার চেষ্টা করতে পারে ব্যাটারা।'

দাঁত বের করে হাসল ও নিঃশব্দে। 'কিচ্ছু চিন্তা করবেন্ না, স্যার। এখন আমরা রেডি, কেউ মাথা তুললেই একদম ইয়ে করে দেব।'

অফ হয়ে গেল ওয়াকি-টকি। ফাঁকি দেয়া গেছে বুঝে আত্মবিশ্বাসের হাসি হাসল রানা। যদি বুঝত কলার ছিল স্বয়ং

কর্নেল মুরাদ, এবং সে ওকে সন্দেহ করে বসেছে, তাহলে দলের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগে ঘিলু গরম হয়ে উঠত।

বেশি কথা বলতে গিয়ে দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে ও কর্নেলকে। এদিকে গ্রেনেড ফেলা হচ্ছে, তা ওদিকের পোস্টের গার্ডরা কেউ জানে না, জানানো হয়নি। ও জানল কি করে? তাই নিয়ে এইডের সাথে কথা বলছে সে এই মুহূর্তে।

নওযাদ পৌঁছল সার্জেন্ট শহীদের 'রিকুইজিশন' করা লরি। এখান থেকে যাবে কালাবিস্ত, তারপর রেজিস্তান।

এরমধ্যে পিছনের নতুন রিক্রুটদের গগনবিদারী ইরান বিরোধী শ্লোগানে মাথা ধরে গেছে দু'জনেরই। মেইন রাস্তা সংলগ্ন এক রেস্টুরেন্টে গাঁটের পয়সা খরচ করে ওদের চা-নাস্তা খাওয়াল শহীদ। নিজেরাও খেল।

দোকানের মালিক এক হাড় সর্বস্ব পাঠান। হাসে কথায় কথায়। হাসি দেখলে মনে হয় দু'পাটি দাঁত ছাড়া ব্যাটার কিছু নেই।

'আমিও যাব তোমাদের সাথে,' শহীদকে বলল সে। এত স্বেচ্ছাসেবী দেখে তারও দেশপ্রেম উথলে উঠেছে হঠাৎ করে। 'লড়াই করব। ইরানী কুকুরদের গুলি করে মারব। দেশের জন্যে খুশি মনে প্রাণ দেব।'

'যাওয়া উচিত,' মৃদু হেসে জবাব দিল ও। 'দেশের এই দুর্দিনে তোমাদের মত বীরদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন।' গোবরগণেশের দল, মনে মনে বলল, জেনারেল প্যাটনের বিখ্যাত উক্তি, 'দেশের জন্যে নিজে আত্মাহুতি দিয়ো না, অন্যদের দিতে দাও' শোনেনি নিশ্চয়ই এরা।

দারুণ হুজুগে জাতি আফগানরা। লড়াই এখনও বাধেনি,

ইরান বলছে মহড়ার জন্যে সীমান্তে সৈন্য জড়ো করা হয়েছে, অথচ এরা সবাই এরইমধ্যে মনে মনে কয়েক ডজন করে ইরানী মেরে বসে আছে।

একটু পর গাড়ি ছাড়ল শহীদ। শেষ পর্যন্ত দেঁতো পাঠানের দেশপ্রেমে বোধহয় ভাটা পড়েছিল, অথবা আরও কোন জরুরী কাজের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল, তাই আসেনি সে। লরি চলছে, সার্জেন্ট চিন্তিত মনে সিগারেট টানছে। ওদিকে হামিদা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। মন খারাপ।

'আর বোধহয় কোনদিন দেশে ফেরা হবে না,' এক সময় বলল সে চাদরে চোখ মুছে। 'ওরা নিশ্চই আমার মা-বড় বোনকে মেরে ফেলেছে এতক্ষণে।'

'শুধু শুধু মন খারাপ করছেন আপনি,' সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল সার্জেন্ট। 'ওরা তা করবে বলে মনে হয় না। নিশ্চই আপনার ভাইয়ের ব্যাপারটা বিবেচনা করবে ওরা।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মেয়েটি। 'কি জানি!'

'আমি বুঝি। বাসার সবার জন্যে, জালালের জন্যে, মন দুর্বল হয়ে আছে আপনার। তারচেয়ে বরং এখন ওসব চিন্তা ছেড়ে অন্য কিছু ভাবুন, নিজের ছেলেবেলার গল্প শোনান আমাকে। দেখবেন, ভাল লাগবে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ও। তারপর প্রায় বিড়বিড় করে বলল, 'মা-বোনের জন্যে খারাপ লাগছে আমার, কিন্তু জালালের জন্যে নয়।'

'মানে?' বিস্মিত হলো সার্জেন্ট।

'ওর কাছ থেকে আলাদা হয়ে পড়ার পর থেকেই নতুন এক চিন্তা এসেছে আমার মনে।'

'কি?'

'আমার ভালবাসা একতরফা ছিল। ও আমাকে ভালবাসত না। তবে ভাববেন না যে জালাল ধরা পড়ায় আমি দুঃখ পাইনি, পেয়েছি। খুব খারাপ লাগছে আমার ওর জন্যে। কিন্তু...আসলে...'

মুখ ঘুরিয়ে ওকে দেখল শহীদ, তারপর ড্রাইভিঙে নজর দিল। 'আপনি ঠিক জানেন জালাল ভালবাসত না আপনাকে?'

'হ্যাঁ। এখন জানি। আসলে ও আমার সাথে যেটুকু ঘনিষ্ঠ হয়েছে, তা শুধু ওর স্বার্থের জন্যে, আমার জন্যে নয়। আমিও সেধেই সাহায্য করেছি ওকে, কিন্তু তখন ওর প্রেমে এত অন্ধ ছিলাম যে ভেতরের চিন্তা মাথায়ই আসেনি। ও কখনও আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু বলেনি, অথচ আমি আকাশ-কুসুম কত কী না ভেবেছি। আমি মনে কষ্ট পাব ভেবে ও চুপ থেকেছে, আর আমি সেটাকে সম্মতি জেনে এগিয়েই গিয়েছি। পিছনে তাকাইনি। আমি জালালের জন্যে প্রয়োজনে দেশ ছেড়ে চলে যেতেও রাজি আছি বলেছি, অনেকবার। ও কেবল শুনেছে চুপ করে, কখনও মন্তব্য করেনি। আমাকে স্রেফ ব্যবহার করেছে লোকটা, কেবল নিজের স্বার্থের কথা ভেবেছে।'

'তাই যদি হয়,' একটু ভেবে বলল সার্জেন্ট। 'তাহলে বলব ও খাঁটি হিরে চিনতে ভুল করেছে।'

চোখ কুঁচকে উঠল হামিদার। 'মানে?'

'মানে, আপনার মত মেয়ের ভালবাসা অর্জন করা অনেক ভাগ্যের ব্যাপার। যে তা না চাইতেই পায়, তার সৌভাগ্যকে আমি হিংসে করি। অমন ভালবাসা হারানোর কথা তো চিন্তাই করা যায় না।'

হেসে উঠল হামিদা। 'তার মানে আপনি পাকা জহুরী?' মাথা দোলাল। 'খুব ভালমানুষ আপনি, সব সময় আমার মন ভাল

রাখার চেষ্টা করেন।'

পিছনে কেউ একজন ধুয়ো তুলতেই ফের শুরু হয়ে গেল শ্লোগান। চোখমুখ কোঁচকাল ওরা।

'বিয়ে করেননি?'

নিজের সম্পর্কে ব্যক্তিগত প্রশ্নে বিব্রত হলো শহীদ। 'না।'

'কাউকে নিশ্চয়ই ভালবাসেন?'

'না।'

আবার নীরব হয়ে গেল মেয়েটি। কি যেন ভাবছে। তারপর বলল, 'যদি আপনার মত একজন জীবন সঙ্গী পেতাম, নারীজন্ম সার্থক হত আমার।'

থতমত খেয়ে গেল ও। দু'গালে লালের আভা দেখা দিল। 'মানে?' কোনমতে বলল। 'আমার মধ্যে এমন কি দেখলেন...' থেমে গেল বক্তব্য শেষ করার উপযুক্ত শব্দ খুঁজে না পেয়ে।

'একজন সত্যিকারের পুরুষকে,' ওর চোখে চোখ রেখে বলল হামিদা। 'স্বামী হিসেবে মেয়েরা মনে মনে যেরকম সংযমী, সাহসী, দরদী মানুষ আশা করে, ঠিক সেরকম একজনকে।'

কথা জোগাল না মুখে, সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল সার্জেন্ট। বুকের ভেতরটা কাঁপছে ওর।

আট

বেল্টের হুকে ঝুলিয়ে নিয়ে আসা টগল রোপের জোড়া দেয়া তিনশো ফুটী কয়েলটা খুলল মাসুদ রানা। এক মাথা শ্যাফটের ববিনে বেঁধে পুরোটা ভেতরে ছেড়ে দিল, অ্যাঙ্গেল-জয়েন্টে কয়েকবার বাধা পেলেও ঘুরপাক্ খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত নিচে পৌঁছে গেল অন্য মাথা। সোজা পানিতে গিয়ে পড়ল।

দড়ি ধরে অনেক সহজে উঠে এল সবাই। করপোরাল সদরউদ্দিন থাকল সবার শেষে, ওঠার পথে প্রতিটা জয়েন্টে দাঁড়িয়ে হুকে বাধিয়ে আগের জয়েন্ট উপড়ে রেখে এল সে। সব গিয়ে জড়ো হয়েছে নিচে। পৌঁছেই যাতে ব্যাটারা পিছু নিতে না পারে, সেজন্যে এই ব্যবস্থা। একেবারে শেষেরটা অবশ্য ছোটানো হলো না। ইচ্ছে করেই ছোটায়নি সে—ওটা কোন অসুবিধের কারণ হবে না ওদের, তাই।

রানা ওদিকে অন্য কাজে ব্যস্ত। চোখ কুঁচকে রিভার ভ্যালির ওয়েল শ্যাফটের দিকে তাকিয়ে আছে। ভিড় পাতলা হয়ে গেছে ওখানকার, একটু যেন চঞ্চল মনে হচ্ছে ওদের। পরিষ্কার বোঝা যায় না, তবে মনে হয় যেন থেকে থেকে এদিকেই তাকাচ্ছে লোকগুলো। প্যান্থার ধ্বংস করার আগে একটা অন্তত দূরবীন কেন রেখে দিল না ভেবে আফসোস করল রানা। তাহলে এখন

নিশ্চিত হওয়া যেত কি চলছে ওদিকে। ওরা কি সত্যিই এদিকে তাকাচ্ছে, না রানা ভুল দেখেছে? চোরের মন পুলিস পুলিস করছে না তো অহেতুক?

যাই হোক, এখানে আর দেরি করা উচিত হবে না। তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হবে। লাশ দুটোর দিকে তাকাল ও। সদরউদ্দিনকে ডেকে কুয়োয় ফেলে দিতে বলল। এতে অল্প সময়ের জন্যে হলেও দ্বিধায় ফেলে দেয়া যাবে সম্ভাব্য অনুসন্ধানী দলকে। পরেরবার ওয়াকি-টকির সাড়া না পেলে ওরা আসবেই, কোন সন্দেহ নেই।

'সেটা কি ঠিক হবে?' বলল সাংবাদিক। 'গ্রামের মানুষ এই ওয়েলের পানি খায় নিশ্চই!'

'অসুবিধে নেই। লাশ কোথায় আছে খুঁজে নিতে বেশি সময় লাগবে না ওদের।'

'কিন্তু রক্ত...?'

'পানি বসে নেই,' জটলার ওপর চোখ রেখে বলল রানা। 'সরে যাবে পানির সাথে। সদরউদ্দিন, জলদি! মনে হচ্ছে একটা জীপ স্টার্ট নিয়েছে ওখানে, এদিকে আসতে পারে।'

দ্রুত কাজ সারল করপোরাল। প্রথম লাশ আছড়ে পড়তে শেষ অ্যাঙ্গেল-জয়েন্টটাও খুলে পড়ে গেল। ধুলোবালি ছড়িয়ে মাটিতে লেগে থাকা রক্তের দাগ যতদূর সম্ভব ঢেকে দিল ওরা, তারপর দ্রুত রওনা হয়ে পড়ল। রানা ঘন ঘন পিছনে তাকাচ্ছে। একটু পর ওর আশঙ্কা মিথ্যে প্রমাণ হলো—এদিকে আসছে না জীপ, উল্টোদিকে যাচ্ছে।

আকাশে আবার মেঘের আনাগোনা শুরু হতে দেখল ওরা। অথচ মাটি তেতে আছে। অসহ্য লাগছে গরম। মাইলখানেক লেপার্ড ক্রল করে এগোল দল, তবে আগেরবারের মত ধীরে নয়,

দ্রুত। ঢুকে পড়ল পাহাড়ের ঢালের বড়সড় এক বাবলা ও ঝাউ বনে। বনটা পাতলা, তবু মাথার ওপর আড়াল পেয়ে অনেক স্বস্তিবোধ করল রানা। প্রায় দৌড়ে নামতে শুরু করল সবাই। এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে বেশ।

দুইশো গজও বোধহয় যেতে পারেনি, আচমকা জমে গেল ওরা পিছনে কট্ কট্ আওয়াজ শুনে। ঘুরে তাকাল—সেই চিনূক!

নাক নিচু করে সবেগে ছুটে আসছে গোঁয়ারের মত। দেখতে দেখতে বনের মাথা ছুঁয়ে ফেলল ওটা। পরমুহূর্তে বিকট বিস্ফোরণের সাথে দুলে উঠল মাটি। 'আড়াল নাও সবাই!' চেঁচিয়ে বলল রানা।

চাগাল। পাকিস্তান। আগের রাতের কথা।

রাতের অন্ধকারে পর্বতের এবড়োখেবড়ো গা বেয়ে উঠে যাচ্ছে 'অপারেশন উদ্ধারের' চার সদস্য। টোপর পরানো মিনি টর্চলাইটের আলোয় পথ দেখে এগোচ্ছে। পথ মানে আসলে বেপথ, অন্তত ওরা যে পথে যাচ্ছে। এতই খারাপ যে চোরাচালানীরাও এদিক দিয়ে আসা-যাওয়া করে না। এ জন্যে এদিকে সীমান্ত রক্ষীদেরও বিশেষ তৎপরতা নেই।

গতকাল ভোর চারটে থেকে একটানা গাড়ি ছুটিয়েছে ওরা, এখানে পৌঁছেছে মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে। তুরবাত, পাঞ্জগুর, খারান কালাত হয়ে ডালবান্দিন, ওখান থেকে ক্যানাল অতিক্রম করে সোজা চাগাল। পুরো রাস্তা তুফান বেগে ছুটেছে ওরা। কারণ পথ অনেক—প্রায় তিনশো মাইল। চাগাল দর্শনীয় কিছু নয়, দূরের হাইওয়ে দিয়ে আসা-যাওয়ার পথে মানুষ তাকিয়ে দেখে, এই পর্যন্তই। বেশি শীত পড়লে, বরফ জমলে, ছবি তুলতে আসে

মানুষ, নইলে এমনিতে এটা চোরাচালানীদের স্বর্গরাজ্য।

সীমান্ত রক্ষীদের টহলও এদিকে কম। ওরা ভারতীয় সীমান্ত অঞ্চল নিয়ে যত ব্যস্ত, ইরান বা আফগানিস্তানকে নিয়ে তার দশ ভাগের এক ভাগও নয়।

থেমে থেমে উঠে যাচ্ছে দলটা। মাঝেমধ্যে জিরিয়ে নেয়ার ফাঁকে ডিটেইলড্ রুট ম্যাপে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে ক্যাপ্টেন কামাল। খনিমুখ যত এগিয়ে আসছে, ততই উত্তেজিত হয়ে উঠছে প্রত্যেকে। আকাশে মেঘ জমেছে প্রচুর, আড়ালে থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। জোর ঝড়বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে।

ঝাড়া তিন ঘণ্টা একনাগাড়ে হেঁটে দুটোর সময় জায়গামত পৌঁছল ওরা, বসে পড়ল আড়াল দেখে। আরও বেশি সতর্ক হয়ে উঠল। একশো গজ সামনে গুহামুখ, ঢুকে পড়লেই হয়, কিন্তু নড়ল না ক্যাপ্টেন। সময় হলে সঙ্কেত দেয়া হবে, তখন এগোবে। টেনশনে রাতের খাওয়া মিস হয়ে গেছে, সুযোগ পেয়ে সে কাজ সেরে নিল এখানে। হাল্কা খেল সবাই। আরও ঘণ্টা দুয়েক হাঁটতে হবে, কাজেই বেশি খাওয়ার উপায় নেই। ওদিকে আসলে আগ্রহও দেখা গেল না কারও।

তিনটের সময় এল সঙ্কেত। লাল হুড পরানো একটা টর্চলাইট টিপ্ টিপ্ করে তিনবার জ্বলে নিভে গেল। তাকিয়ে থাকল ওরা অন্ধকারের দিকে–কোর্স এখনও পুরো হয়নি। ত্রিশ সেকেন্ডের মাথায় আবার তিনবার জ্বলল ওটা, আরও ত্রিশ সেকেন্ড পর আবার। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে পাল্টা সঙ্কেত দিল ক্যাপ্টেন। আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল দল নিয়ে।

দুটো ছায়া নড়ে উঠল সামনে। একজন করাচীর আরেক বিসিআই এজেন্ট, মুর্তজা। অন্যজন তার স্থানীয় কন্ট্যাক্ট। কাছাকাছি যেতে একটা ছায়া পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠল, 'পথ

হারিয়েছেন?'

'হ্যাঁ,' কামাল জবাব দিল। 'চমন ক্যানালে মাছ ধরতে যেতে চাই, কিন্তু রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না।'

'আমার সাথে আসুন, চিনিয়ে দিচ্ছি।'

'আমি কামাল।'

'মুর্তজা,' হাত বাড়াল লোকটা। অন্যজনের সাথে আনুষ্ঠানিক আলাপ করিয়ে দেয়ার গরজ দেখাল না। তবে সে যে হায়দার বালুচ, এবং খানদানী চোরাচালানী, তা জানাল। বাড়ি তার কোয়েটা। নিজে পাচার করে হোসিয়ারির সুতো, কেনে ভেড়ার চামড়া। রমরমা ব্যবসা। চেহারা, পোশাক, আর ঘড়ি-আংটির বাহার দেখে তা ওরাও বুঝল। এ অঞ্চলের সীমান্ত রক্ষীরা নাকি ভুলেও এর কাজে নাক গলায় না, সে এ-দেশী হোক, কি আফগান। সবার সাথে সমান খাতির।

অবশ্য এ ধরনের ছোটখাট কাজ করে না লোকটা, আজই প্রথম। কারণ বিসিআইয়ের টোপ যথেষ্ট 'হ্যান্ডসাম' মনে হয়েছে তার। শুধু গেলাম আর এলাম, তাতেই যদি এত টাকা আসে, তো করবে না কোন্ গাধা? প্রস্তাব পেয়ে প্রথমে একটু দ্বিধায় অবশ্য পড়েছিল হায়দার বালুচ, কোথাকার কারা না কারা, কি ফ্যাসাদ বাধায় ও দেশে গিয়ে কে জানে? পরে ভাবল, ফ্যাসাদ যদি বাধায়, বাধাবে আফগানিস্তানে। তার কি? বিপদ বুঝলে এদের সাথে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করলেই তো চুকে গেল ল্যাঠা। অতএব বোকামি করেনি হায়দার বালুচ।

আগে আগে চলল সে পথ দেখিয়ে। পাহাড়ী ছাগলের মত হাঁটছে মানুষটা, একদম সহজ-সাবলীলভাবে। যেন চাগাল আর মসৃণ হাইওয়েতে কোন ফারাক নেই। একটু পর খনির শ্যাফটে ঢুকে পড়ল ওরা, সঙ্গে সঙ্গে খিচুড়ি মার্কা বোটকা এক গন্ধে

পেটের মধ্যে ঘুলিয়ে উঠল কামালের।

ঘাম, তামাক, পাথুরে মাটি আর মরে পচে ওঠা ইঁদুরের দুর্গন্ধ প্রবল। তার সাথে পেশাবের তীব্র ঝাঁঝাল গন্ধ মিলে স্রেফ নরক বানিয়ে রেখেছে ভেতরটাকে। অসহ্য! কিন্তু ওদের যত অসুবিধেই হোক, বালুচের বাচ্চার কিছুই হচ্ছে না। একবারও নাক কোঁচকাতে বা অভিযোগ জানাতে দেখা গেল না ব্যাটাকে। এই জন্যেই বোধহয় বলা হয়েছে 'শরীরের নাম মহাশয়, যাহা সহাইবেন তাহাই সয়', কামাল ভাবল। ভুলে থাকার চেষ্টা করল ব্যাপারটা, অন্যদেরও সেই পরামর্শ দিল।

অল্প সময়ের মধ্যে আশ্চর্য ফল হলো। নাক আর মস্তিষ্ক সয়ে নিল অমন বদ গন্ধ। প্রথমটা মন দিল সিগারেটের গন্ধে, পরেরটা মিশনের চিন্তায়।

আলোয় পথ দেখে আঁকাবাঁকা গুহা ধরে চলেছে ছয়জনের দলটা। কোথাও ঝুঁকে হাঁটছে, কোথাও সোজা হয়ে। যত ভেতরে ঢুকছে, তত বাড়ছে গুমোট গরম, দরদর করে ঘামছে সবাই। বাতাসে অক্সিজেনের অভাব বলে জোরে জোরে দম নিতে হচ্ছে। সমস্যাগুলো একটু একটু করে বেড়ে চলল, গরম আর নিঃশ্বাসে কষ্ট অসহ্য হয়ে উঠল এক সময়। পিঠের বোঝার জন্যে কষ্ট আরও বেশি হচ্ছে। তবু সব সহ্য করে এগিয়ে চলল কামাল বাহিনী।

এক সময় আবার স্বাভাবিক হয়ে আসতে শুরু করল পরিস্থিতি, ধীরে ধীরে। কখন পুরো স্বাভাবিক হলো, টেরই পেল না কেউ। সাড়ে চারটায় শ্যাফটের অন্য মাথায় পৌঁছল ওরা। বাইরে তখন প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির মাতম চলছে। সেদিকে তাকিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ক্যাপ্টেন কামাল। সামনে গাছপালার ভেতর দিয়ে আধ মাইল গেলেই চমন ক্যানাল। তার ওপারে

মেইনল্যান্ড।

ক্যানাল না বলে ওটাকে নদী বলাই ভাল। অনেক লম্বা-চওড়া। আফগানিস্তান থেকে কোয়েটার মাসটাং হয়ে পাকিস্তানে গিয়ে পড়েছে, ওখান থেকে ঘুরেফিরে ইরান বর্ডারে। আসার পথে ডালবান্দিনে এই ক্যানালই পার হয়েছে ওরা।

বোঝা পাশে রেখে বসে পড়ল সবাই, পা মেলে দিয়ে বোঝায় ঠেস্ দিয়ে বসল। হায়দার বালুচ একটু দূরে বসে সিগারেট ধরিয়ে গুন্‌গুন্ গান ধরল। বেশ খোশ মেজাজে আছে ব্যাটা। মুর্তজা বসল কামালের কাছে। ক্লান্তি আর ঠাণ্ডা বাতাসের পরশে কথা বলতে বলতে কখন চোখ লেগে এসেছিল জানে না ক্যাপ্টেন, হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসল সে। ঝড় থেমে গেছে।

বৃষ্টি অল্প অল্প আছে, নইলে একদম শান্ত পরিবেশ। অদ্ভুত রকম শান্ত। চট্ করে ঘড়ি দেখে নিল সে—প্রায় পাঁচটা। আশেপাশে তাকাল, সবাই ঘুমে বিভোর। শীতে গুটিসুটি মেরে ব্যাকপ্যাকে মাথা রেখে শুয়ে আছে। বাইরে ফুটি ফুটি করছে দিনের আলো, কিন্তু ঘন মেঘের জন্যে সুবিধে করতে পারছে না। মেঘের ভেতরে এখনও বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে থেকে থেকে। বাতাস প্রায় স্থির।

মুর্তজাকে ডেকে জাগাল কামাল, তারপর অন্যদেরকেও। নীরবে শ্যাফট থেকে বেরিয়ে পড়ল ওরা। বনের ভেতরে বাড়িঘর আছে প্রচুর। বেশিরভাগই চোরাচালানী এসবের বাসিন্দারা, কিছু জেলেও আছে। আর আছে পেশাদার রাখাল ও চাষী। একজন-দু'জন করে ঘর ছাড়তে শুরু করেছে তারা। কেউ কেউ ওদের দেখল তাকিয়ে, কিন্তু চোখে বিন্দুমাত্র কৌতূহল ফুটল না। নিত্য নতুন চোরাচালানী দেখে দেখে অভ্যস্ত, বোঝাই যায়।

তবে হায়দার বালুচকে শুধু দেখলই না, শ্রদ্ধার সাথে সালামও

করল প্রত্যেকে। তাদের সালামের জবাবে মাথা দোলাতে দোলাতে গজেন্দ্র চালে নামতে থাকল লোকটা, দুয়েকজনকে পাল্টা কুশলও জিজ্ঞেস করল। মোমের মত গলে পড়ার দশা হলো মানুষগুলোর। বালুচের এই জনপ্রিয়তা হারামের পয়সার জোরে অর্জিত হলেও রীতিমত ঈর্ষণীয়, ভাবল কামাল। ভালই জমিয়ে নিয়েছে।

ক্যানালের তীরে বেশ বড় ঘাট। নৌকা, স্পীডবোট, ছোট ফিশিং ট্রলার, সব আছে ওখানে। পাঁচ মিনিট পর ওখান থেকে দুটো স্পীডবোট রওনা হয়ে গেল ওপারে মেইনল্যান্ডের উদ্দেশে।

গ্রেনেড!

গ্রেনেড ছুঁড়ছে চিনুক। কিন্তু প্রথমটা তাড়াহুড়োয় মিস্ করেছে, শুয়ে পড়ে অথবা গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বেঁচে গেছে ওরা। আচমকা হামলায় ঘাবড়ে গেছে যূথী, প্রাণভয়ে তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে।

'স্মোক গ্রেনেড মারো!' রোটরের জোর আওয়াজ ছাপিয়ে উঠল মাসুদ রানার কণ্ঠ। 'স্মোক গ্রেনেড! জলদি...!'

ওর নির্দেশ পুরো হলো না, তার আগেই অস্পষ্ট একটা টং আওয়াজ উঠল কাছে, পরমুহূর্তে আরেকটা। দেখতে দেখতে ঘন সবুজ ধোঁয়ায় চারদিক ভরে উঠল, দুটো ব্যাঙের ছাতার আকার নিয়ে ওপরদিকে উঠে যেতে চাইছে, কিন্তু রোটরের সৃষ্ট ঝোড়ো বাতাসের জন্যে পারছে না। ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আওয়াজ শুনে বোঝা যায় অনেক কাছে এসে পড়েছে, কিন্তু উঁকি দিয়েও ওটাকে দেখতে পেল না রানা।

ব্যস্ত হাতে লঞ্চারে ফিন গ্রেনেড লোড করল, মোটা কাণ্ডের এক ঝাউ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি দিল। ঠিক তখনই পড়ল

দ্বিতীয় গ্রেনেড। পরমুহূর্তে চতুর্দিক কাঁপিয়ে হুঙ্কার ছেড়ে উঠল একটা হেভি মেশিনগান। ওটার কট্ কট্ কট্ কট্ আওয়াজে কানে তালা লেগে গেল সবার। দ্বিতীয় বিস্ফোরণের ধাক্কা সামলে আবার উঁকি দিল রানা, কিন্তু সবুজ ধোঁয়া ছাড়া কিছুই দেখল না। ওপরে উঠতে না পেরে ছেঁড়া মেঘের মত ওদেরকেই ঘিরে পাক্ খাচ্ছে।

বুমেরাং হয়ে গেছে।

লঞ্চার তুলে ট্রিগার টেনে দিল রানা, কিছুই হলো না। এমনিতে আন্দাজে ছুঁড়েছে ও, তারওপর এক মুহূর্ত আগেই লেজ ঘুরিয়ে জায়গা থেকে সরে গেছে চিনূক। সোজা উত্থানের শীর্ষে উঠে রংধনুর মত বাঁক নিয়ে ক্রমে দূরে সরে গেল গ্রেনেড। যূথী তখনও সমানে চ্যাঁচাচ্ছে, ওর গায়ে গুলি লেগেছে ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল রানা।

কিন্তু এখন দেখার সময় নেই, ব্যস্ত হয়ে দ্বিতীয় গ্রেনেড লোড করল ও লাঞ্চারে। একটু বিরতি দিল মেশিনগান, কন্টার জায়গা ছেড়ে আরও কিছুটা সরে গেল। বাতাসে ডালপালা ভীষণভাবে আন্দোলিত হচ্ছে। আবার গর্জে উঠল মেশিনগান। তার মুহূর্তখানেক আগে জাফরের ক্ষীণ চিৎকার শোনা গেল, 'ট্রুপার ড্রপ্ করছে!'

প্রমাদ গুণল রানা। মেশিনগানের গুলির তোড়ে জায়গায় বসে থাকতে ওদের বাধ্য করে এই ফাঁকে সৈন্য নামাচ্ছে চিনূক। সেটাই অবশ্য হওয়ার কথা। ব্যস্ত হয়ে উঠল ও কিছু একটা করার জন্যে। গুলির প্রথম তোড় থামার সঙ্গে সঙ্গে আড়াল ছেড়ে ছুটল কাছের আরেক গাছের দিকে। ওরই মধ্যে চোখের কোণ দিয়ে পাঁচ হাতের মধ্যে ডন ও যূথীকে উট পাখির মত মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে দেখল রানা।

'নড়বেন না জায়গা ছেড়ে!' দৌড়ের ফাঁকে ওদের সতর্ক করল রানা, পরের পশলা শুরু হওয়ার আগে লম্বা তিন লাফে আরেক গাছের আড়ালে পৌঁছে গেল। একই সময় কাছেই কোথাও পাল্টা গর্জন ছেড়ে উঠল একটা হেকলার অ্যান্ড কচ। ওটা সদরউদ্দিন। হাঁটু গেড়ে গুলি করছে সে। অন্যদেরও তার কাছেপিঠে দেখা গেল। পাতলা ধোঁয়ার মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি মেরে সামনে দেখার চেষ্টা করছে।

কিন্তু ওরা নয়, রানাই আগে দেখল প্রথম ট্রুপারকে। মনে হলো যেন আচমকা মাটি ফুঁড়ে উদয় হয়েছে মানুষটা। সদরউদ্দিনের কয়েক গজ দূরে বসে থাকা হেকমত আলির দিকে অস্ত্র তুলছে পিছন থেকে। দৌড়ঝাঁপ করতে গিয়ে তার পায়ের কাঁচা ক্ষত থেকে নতুন করে রক্তপাত শুরু হয়েছে, ব্যান্ডেজ ভিজে উঠেছে।

সতর্ক করার সময় নেই, দ্রুত লাঞ্চার তুলেই ট্রিগার টিপে দিল রানা। থপ্ করে লোকটার বুকে আছড়ে পড়ল ফিন গ্রেনেড। ধাক্কার চোটে ঝাঁকি খেয়ে পিছনে হেলে পড়ল সে, কারবাইন ধরা হাত ইঞ্চিখানেক ওপরে উঠল, তারপর বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড। চোখের সামনে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে উড়ে গেল মানুষটা। চমকে উঠে ঘুরে তাকাল সবাই। পরিস্থিতি ভুলে চোখ বড় করে উঠে বসতে যাচ্ছিল হেকমত, জাহাঙ্গীরের ধমক খেয়ে বসে পড়ল।

মেশিনগান বিরতি দিয়েছে দেখে চেঁচিয়ে বলল রানা, 'কতজন নেমেছে?'

'পাঁচজনকে দেখেছি,' জাফর জবাব দিল।

'আরও চারজন আছে তাহলে। সাবধান!' বলেই গুলির আওয়াজ শুনে ঝপ্ করে মাথা নামিয়ে নিল, একই মুহূর্তে ঠক্ ঠক্ করে অসংখ্য বুলেট আছড়ে পড়ল গাছের গুঁড়িতে, ওর মাথার

বড়জোর তিন ইঞ্চি ওপরে। পর পর আরও দুটো গ্রেনেড পড়ল ওপর থেকে, দুলে উঠল গোটা বন। সামলে নিয়ে এদিক-ওদিক তাকাল রানা, দেখতে পেল না কাউকে। তার মানে আড়াল নিয়েছে ট্রুপারি।

লঞ্চারে শেষ গ্রেনেড ভরে নিল ও ব্যস্ত হাতে, তারপর ওটা পাশে রেখে কাঁধ থেকে কারবাইন নামাল। গুলি যেদিক থেকে এসেছে, সেদিকে চোখ নেচে বেড়াচ্ছে। ওটাকে ঠাণ্ডা করা না গেলে বড়রকম বিপদ ঘটে যেতে পারে।

চিনূকের মেশিনগান থেমে গেল। উঁকি দিল রানা, এবং দেখতে পেল ওটাকে। পিছিয়ে গিয়ে শ'দেড়েক গজ দূরে স্থির হয়ে ভাসছে। নিচ থেকে বাধা আসছে না দেখে ফলাফল বোঝার চেষ্টা করছে বোধহয়। পাইলটের পাশে এক যুবককে দেখতে পেল রানা, ব্যস্ত হয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। হাত নেড়ে কি যেন বলছে পাইলটকে। পর পর দুই গুলির শব্দে মনোযোগ ছুটে গেল রানার, নজর ডানে ঘোরাতে এক ট্রুপারের ওপর চোখ পড়ল। দুই হাতে রক্তে ভেসে যাওয়া বুক চেপে ধরে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে।

সদরউদ্দিনকে হাসতে দেখল রানা, তার মানে কাজটা ওরই। 'আমাকে কাভার দাও সবাই!' বলেই এঁকেবেঁকে, গাছের আড়ালে আড়ালে চিনূকের কাছে যাওয়ার জন্যে দৌড় শুরু করল ও। পিছনে ছয়টা হেকলার অ্যান্ড কচ কারবাইন থেমে থেমে গর্জে চলেছে বাকি তিন ট্রুপার যাতে মাথা তুলতে না পারে, সেই জন্যে।

এক হাতে কারবাইন, অন্য হাতে গ্রেনেড লাঞ্চার ঝুলিয়ে শিম্পাঞ্জির মত ছুটছে রানা। গ্রেনেড আর একটাই আছে, ওটা মিস্ করতে চায় না। বিনা বাধায় পঞ্চাশ গজমত এগিয়ে গেল ও,

লঞ্চার তুলল কারবাইন ফেলে। ট্রিগার টানতে যাবে, এই সময় আচমকা উঠে যেতে শুরু করল চিনূক।

বাতাসের চাপ কমে যাওয়ায় নাচানাচি বন্ধ হয়ে গেল গাছের, রানার দৃষ্টিপথ ঢাকা পড়ে গেল। লঞ্চার নামিয়ে তাকিয়ে থাকল রানা ব্যাপার বুঝতে না পেরে। কিছুটা উঠেই সোজা দক্ষিণে দৌড় লাগিয়েছে তখন চিনূক।

ক্যাপ্টেন কামালের দিকে ঘুরে তাকাল সার্জেন্ট কবির। ক্যানালের এপারে, লোকালয় থেকে দূরের ছোট এক পাহাড়ের ওপর ঝোপঝাড়ের আড়ালে বসে আছে ওরা চারজন। থান্ডারবোল্ট টীমের দেরি দেখে প্রত্যেকে উদ্বিগ্ন। রাত থাকতে পৌঁছার কথা ওদের, অথচ দুপুর হতে চলেছে এখনও দেখা নেই।

কামাল উপুড় হয়ে শুয়ে দূরবীন দিয়ে উত্তরের এক ঢালের দিকে তাকিয়ে আছে। জায়গাটা মাইল দুয়েক দূরে। এমনি এমনি নয়, একটু আগে মনে হলো যেন ওদিকে কিছু লোকের নড়াচড়া দেখেছে সে, তাই। ওদিকে খেত বা বাগান কিছু নেই, শুধুই পাহাড়ী বন। ওখানে ওরা তাহলে কারা? নাকি ভুল দেখেছে সে?

'স্যার, কয় ঘণ্টা ওভারডিউ হলো?' জানতে চাইল কবির।

'প্রায় চার ঘণ্টা।'

'তাহলে হয়তো বড় কোন বিপদে পড়েছে টীম,' বলে কোলের ওপর রাখা তেল চকচকে কারবাইনে হাত বোলাল সে। যেন ওতেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

করপোরাল আহসান হাবিব পরামর্শ দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'অথবা হয়তো গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে, বা ট্রান্সমিটারে কোন সমস্যা...'

'প্রথমটা হতে পারে,' হাবিব বলল। 'পরেরটা অসম্ভব।

আলাল যেখানে আছে, সেখানে ট্রান্সমিশনের সমস্যা পয়দাই হতে পারে না।'

হঠাৎ করে লাফ দিয়ে উঠে বসার আয়োজন করল ক্যাপ্টেন। 'হোয়াও! একটা চপার!' উত্তেজনায় চোখের সাথে ঠেসে ধরেছে বিনকিউলার।

'অ্যাঁ, কোথায়?'

হাত তুলে জায়গাটা দেখাল সে। 'ওই যে, বনের মধ্যে...গড! সবুজ ধোঁয়া। তার মানে মাসুদ ভাইদের...'

অন্যদের দূরবীনের দরকার হলো না। জায়গাটা বেশি দূরে নয়, তাছাড়া ওরা উঁচুতে রয়েছে, কাজেই খালি চোখেই দেখা যাচ্ছে।

কামাল ভাবছে একটু আগে তাহলে ওদেরকেই দেখেছে সে। নিশ্চয়ই তাই। কিন্তু পায়ে হেঁটে কেন ওরা? পিঙ্ক প্যান্থার কোথায়? ক্যানালের তীরে পৌঁছে না ওগুলোর ব্যবস্থা করার কথা ছিল?

দূরবীন থেকে চোখ না সরিয়ে উঠে বসল সে। 'কঠিন সমস্যা হয়ে গেছে ওদিকে,' বলল সবার উদ্দেশে। 'মাসুদ ভাইদের কোণঠাসা করে ফেলেছে ব্যাটারা। গাড়ি নেই, হেঁটে আসছিল দল...' থেমে গেল। পরক্ষণে রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল, 'ট্রুপার! শালারা ট্রুপার নামাচ্ছে!'

কেউ কোন মন্তব্য করল না, প্রশ্নও না। কারণ ওরা সবই দেখতে পাচ্ছে। অ্যাবসেইল রোপ বেয়ে বড় গুবরে পোকার মত সাইজের সৈন্য নামছে কপ্টার থেকে। এখান থেকে দড়ি দেখা যাচ্ছে না অবশ্য, মনে হচ্ছে যেন বাতাস ধরে ধরে নামছে ব্যাটারা সরসর করে। নিচে সবুজ ধোঁয়ায় চারদিক ঢাকা পড়ে গেছে। রোটরের বাতাসে ক্রমে আরও ছড়াচ্ছে।

'ছয় ট্রুপার নেমেছে!' বলল কামাল। দ্রুত এদিক-ওদিক

তাকাল। ওদের ডানদিকে, দূরে একটা পাহাড়ী রাস্তা দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে সাপের মত এঁকেবেঁকে চলে গেছে। ওদিকটা ফাঁকা। আর সবদিকও তাই, কোথাও মানুষের চিহ্নও নেই। পিছনে আছে, ক্যানালের দিকে। তবে ঝোপের আড়াল আছে বলে ওদিক থেকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না ওদের। এখানে থানা গেড়ে বসার সময়ও দেখেনি, কারণ তখনও যথেষ্ট আঁধার ছিল।

দ্রুত কিছু ভাবল ক্যাপ্টেন। থান্ডারবোল্টের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। যদিও এমন কিছুর নির্দেশ নেই। কথা ছিল অন্ধকার থাকতে পৌঁছবে টীম, তখন প্রয়োজনে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত কমান্ডোদের সরে পড়তে সাহায্য করতে হবে। কিন্তু যে জন্যেই হোক, পরিস্থিতি এখন অন্যরকম।

গাড়ি নেই, ঘেরাওর মধ্যে পড়ে গেছে টীম। অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে, এরকম জরুরী মুহূর্তে দূরে বসে তামাশা দেখা সম্ভব নয় তার পক্ষে। তাছাড়া সবকিছুই নির্দেশ মত চলতে হবে, এমন কোন নির্দেশও তো নেই। কাজেই উঠে পড়ল সে। 'কুইক! রেডি হও সবাই, আমরা যাচ্ছি ওদিকে।'

সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ পালন করতে লেগে পড়ল সঙ্গীরা। যে যার বোঝা কাঁধে ঝুলিয়ে এগোতে যাবে, এমনসময় উঠে পড়ল কপ্টার। হঠাৎ করে এদিকেই ছুটে আসতে শুরু করল।

'দাঁড়াও! ওটা এদিকে আসছে। জলদি কাভার নাও, জলদি!'

ঝোপের মধ্যে শুয়ে ওটাকে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখল সবাই। ওদের পাহাড় টপ্‌কে পাঁচ-ছয়শো গজ গিয়ে থেমে পড়ল শূন্যে। তোড়জোড় দেখে মনে হলো ওখানেও ট্রুপার ড্রপ্ করতে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তাই! পিছনের স্লাইডিং ডোর খুলে গেল; সাপের মত দোল খেয়ে নেমে এল দীর্ঘ অ্যাবসেইল রোপ। পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুরো দেড় ডজন সৈন্য নামিয়ে ফের উত্তরে রওনা

হলো চিনূক।

বোকার মত মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল 'উদ্ধার' মিশনের চার সদস্য। ট্রুপাররা তখন নিচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পজিশন নিতে ব্যস্ত। বনের ফাঁদ থেকে শত্রু যদি কোনমতে পালিয়ে আসতে পারে, এখানে ঠেকানো হবে।

কি করা যায় ভাবছে কামাল, তখনই হঠাৎ খড়মড় করে উঠল তার পকেটফোনের ইয়ারপীস। কাছেই ক্ল্যানসম্যান রেডিও সেটের ওপর ছিল ওটা, তুলে নিল সে থাবা দিয়ে।

'থান্ডারবোল্ট টু স্যালভেজ, ডু ইউ রীড? ওভার।'

'মাসুদ ভাই?' উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল ক্যাপ্টেন। 'আপনি?'

চাপা হাসি শোনা গেল ওর। 'কি হলো, ভয় পেলে নাকি? সরি। তোমার সেট অন্ রেখেছ বলে ধন্যবাদ। আমাদের দুটোই শেষ। তোমরা কতদূরে? ওভার।'

'আপনাদের খুব কাছে। এখান থেকে আপনাদের পজিশন দেখতে পাচ্ছি আমরা খালি চোখেই। ওভার।'

'কী আশ্চর্য! ওরা আমাদের ধরে ঝোলায় পোরার ব্যবস্থা করছে আর তোমরা বসে বসে তাই দেখছ?'

এরমধ্যেও মানুষটা ঠাট্টা করছে দেখে ভারি অবাক হলো ক্যাপ্টেন।

'তোমার গলা এত আস্তে শোনাচ্ছে কেন? ওভার।'

'এইমাত্র চপারটা এদিকে ট্রুপার ড্রপ করে গেছে, এই জন্যে। আপনাদের ওদিকেও তো ছয়জন নেমেছে। ওভার!'

'হ্যাঁ, তিনজন গেছে। বাকিগুলোকে খুঁজছি। ওদিকে কতজন নেমেছে? ওভার।'

'দেড় ডজন। ওভার।' চপার থামছে না, দেখল কামাল, বন ডিঙিয়ে চলে যাচ্ছে।

'পজিশন? ওভার।'

'ক্যানালের মাইলখানেক এপাশে। হাইগ্রাউন্ডে পজিশন নিচ্ছে, ঠিক আমাদের লাইন অভ অ্যাপ্রোচ বরাবর। ওভার।'

'মুশকিলে পড়া গেল!' নিজের মনে বলল রানা। 'একজন মেয়ে, দু'জন আহত, কি করে...'

'মাসুদ ভাই, দলের একজন কমে গেছে শুনেছি। কে সে? ওভার।'

'একজন ছিল, এখন দু'জন হয়েছে। সার্জেন্ট শহীদ আর করপোরাল ফয়েজ। ওভার।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে ধাক্কাটা সামাল দিল ক্যাপ্টেন কামাল। 'শহীদ! ফয়েজ!! বিশ্বাস হয় না!' হেডসেটে পর পর দুটো গুলির শব্দ শুনে সচকিত হলো। 'কি হলো, মাসুদ ভাই? ওভার।'

'আরেকটাকে নিয়েছে আলাল।' কাজের কথা পাড়ল রানা। ঠিক হলো, আফগানদের বেষ্টনীর বাইরে দিয়ে ঘুরে ক্যানালের দিকে এগোবে থান্ডারবোল্ট দল, রানা ও সদরউদ্দিন ছাড়া। ওরা কামাল বাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে শত্রুকে জায়গায় বসে থাকতে বাধ্য করবে।

দলের অন্যরা ক্যানালে পৌঁছে গেছে বুঝলে রানা ও সদরউদ্দিন মরিয়া লড়াই করে পথ বের করে ভাগবে। তারপর বোট নিয়ে ক্যানাল ধরে সোজা পাকিস্তান।

'আপনার গুলির স্টক কেমন? ওভার।'

'খুব খারাপ,' রানা বলল। 'প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। ওভার।'

'ঠিক আছে। আমাদের এখানে চলে আসুন বাকি দুটোকে শেষ করে। তারপর দেখা যাবে। ওভার।'

দুশ্চিন্তায় পড়েছে সার্জেন্ট শহীদ। পথে একবার এঞ্জিনের সমস্যা

মেটাতে, আরেকবার উত্তপ্ত হয়ে ওটা রেডিয়েটরকে পানি খাইয়ে শান্ত করতে অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে। পিছিয়ে পড়েছে সে।

অন্ধকার থাকতে জায়গামত পৌঁছার কথা, হলো না। ওর ধারণা বহু আগেই পগার পার হয়ে গেছে থান্ডারবোল্ট। অর্থাৎ যেতে হলে এখন তাকে নিজের ব্যবস্থায় যেতে হবে। সেটা কি, করে সম্ভব করবে, তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে।

ওদিকে নতুন 'রিক্রুটরা' কেউ কেউ সন্দেহ করতে শুরু করেছে সার্জেন্টকে। যুদ্ধের ডামাডোল বাজছে ইরানের সাথে, অথচ লোকটা এদের নিয়ে এসেছে পাকিস্তানের গায়ের ওপর, এর কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছে না ওরা। সে অবশ্য বলেছে এদিকে কোথাও একদল ইরানী গুপ্তচর আছে বলে গোয়েন্দা সূত্রের খবর আছে তার কাছে। এই কারণেই এখনও মুখ বুজে আছে ছেলেরা।

এছাড়া হামিদা গুলিস্তানী নিজের তো বটেই, শহীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে খুব উদ্বিগ্ন। কি হয় কি হয় করে অস্থির।

পাহাড়ী রাস্তায় দোল খেতে খেতে ছুটে চলেছে লরি। আর দু'মাইল যেতে পারলেই ক্যানাল। একটা বাঁক ঘুরল শহীদ, সামনে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ কুঁচকে উঠল দূরে একটা কপ্টার দেখে। কি ওটা! ভেতরে ভেতরে জোর এক ঝাঁকি খেল সে, চিনূক না? ট্রান্সপোর্ট চপার! কিন্তু ওটা কি করছে ক্যানালের কাছে? চমকে উঠল, স্লাইডিং ডোর খোলা কেন ওটার! ট্রুপার ড্রপ্ করে ফিরছে নাকি?

গ্যাস পেডালে চাপ বাড়িয়ে দিল সে আপনাআপনি। বুকের ভেতরে অদ্ভুত আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে। মন বলছে ওটার উপস্থিতি আর স্লাইডিং ডোরের খোলা থাকার কারণ বুঝতে পেরেছে সে। আশায় মন দুলে উঠল।

*

কয়েক মাইল উত্তরের এক ফার্মহাউসে ল্যান্ড করল চিনূক। ভোরে এখানেই ওটাকে দেখেছে রানা। রোটর থামার অপেক্ষায় থাকার ধৈর্য নেই কর্নেল মুরাদের এইডের, তীব্র ঝোড়ো বাতাসের মধ্যেই বেরিয়ে এল সে। নুয়ে পড়ে একদৌড়ে নিচু এক বার্নের দিকে এগোল।

ভেতরে চেয়ারে বসে চোখ বুজে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে কর্নেল, হাতে কেন্ট পুড়ছে। 'বলো।'

হড়বড় করে রিপোর্ট করতে শুরু করল যুবক। তার বলা শেষ হতে মাথা ঝাঁকাল মুরাদ। কাপে শেষ চুমুক দিল। 'অপেক্ষা করো। আমি যাব।'

নয়

সদরউদ্দিন শুরু করল ব্যাপারটা। দুটো গুলি করল, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল অন্য পক্ষ। প্রথমে একটা-দুটো কারবাইন সাড়া দিল, তারপর একযোগে সব কটা। এতগুলো অটোম্যাটিকের টানা হুঙ্কারে ভেঙে খান্ খান হয়ে গেল নিস্তব্ধ পরিবেশ। বুলেটের ধাক্কায় ধুলোবালি আর মাটির চাপড়া উড়তে লাগল এখানে-সেখানে।

আফগানদের বেশিরভাগ বুলেটই একদম আশেপাশে পড়ছে

ওদের। মাথার ওপর দিয়ে ক্ষিপ্ত বোলতার গুঞ্জন তুলে ছুটে যাচ্ছে। এক ট্রুপারকে ঝোপের ফাঁক থেকে উঁকি দিতে দেখে সই করে গুলি ছুঁড়ল রানা, কিন্তু লাগাতে ব্যর্থ হলো। হলিউডি স্টান্টম্যানদের মত দর্শনীয় এক ডিগবাজি খেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা।

'বাহ্, দারুণ তো!' হেসে উঠল ক্যাপ্টেন কামাল। 'ক্যামেরা থাকলে ছবি তুলে রাখা যেত ব্যাটার!'

পাল্টা রসিকতা করল না কেউ। এর মধ্যে আফগানদের গুলির বেগ আরও অনেকগুণ বেড়ে গেছে, মুহূর্তের জন্যেও থামছে না। তা নিয়ে অবশ্য দুশ্চিন্তার কিছু নেই রানার, বরং অগ্রগামী দলের ওপর থেকে যে লোকগুলোর দৃষ্টি সরিয়ে রাখা গেছে, তাতেই সন্তুষ্ট। দেড় ঘণ্টা আগে ঘুরপথে ক্যানালের দিকে রওনা হয়ে গেছে ওরা জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বে। এতক্ষণে নিশ্চই যথেষ্ট দূরে সরে গেছে। এদিকে বাকি তিন ট্রুপারের দুটোকে শেষ করতে পেরেছিল ওরা শেষ পর্যন্ত, অন্যটা বিপদ বুঝে পালিয়ে গেছে।

টানা দশ মিনিট পর ভাটা পড়ল গুলির তোড়ে। তারপর থেমে গেল। আড়াল ছেড়ে উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করল ওরা কাজ কতখানি হয়েছে বোঝার জন্যে। এ তরফের সাড়া নেই দেখে একজন-দু'জন বেরিয়ে এল, তবে উঠে দাঁড়াবার সুযোগ পেল না। তিন সেকেন্ড ব্রাশ ফায়ার করে আবার ওদের শেল্টার নিতে বাধ্য করল রানা।

ফের শুরু হয়ে গেল। এবার আর থামাথামির লক্ষণ নেই, চলছে তো চলছেই।

'চলুক আরও কিছুক্ষণ,' বলল রানা। 'তারপর...!'

পনেরো মিনিট পর ওর মনে হলো যথেষ্ট হয়েছে, এবার শুরু করা যেতে পারে। ইঙ্গিত দিল কামালকে। 'শুরু করো।'

নিজের ভারী ব্যাকপ্যাক থেকে খুদে লাইটওয়েট শোল্ডারবোর্ন মর্টার লঞ্চার বের করে তৈরি হয়ে নিল সে। ৬০ এমএম হচকিস-ব্র্যান্ডট কমান্ডো মর্টার ওটা, নির্ভুল লক্ষ্যে আঘাত হানতে অদ্বিতীয়। পরপর তিনটে ফসফরাস বোমা ছুঁড়ল ক্যাপ্টেন শত্রু অবস্থান সই করে। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে ঘন, দুর্ভেদ্য ধোঁয়ার দেয়াল মাথা তুলল দুই দলের মাঝখানে, পরস্পরের সম্পূর্ণ চোখের আড়াল হয়ে গেল ওরা। পরক্ষণে হাই-এক্সপ্লোসিভ বোমা ডিসচার্জ করল মর্টার।

তির্যক রেখা ধরে সোজা ধোঁয়ার ঠিক ওপাশে গিয়ে পড়ল ওগুলো, শুরু হলো একের পর এক বিস্ফোরণ, তার সাথে বিদ্যুৎ চমকের মত ঘন ঘন তীব্র লালচে ফ্ল্যাশ।

'চলো এবার।'

উঠে পড়ল সবাই, কোনাকুনি দৌড়ে নামতে শুরু করল পাহাড় থেকে। নিচে এসে ফের দুটো করে ফসফরাস ও এক্সপ্লোসিভ বোমা ছুঁড়ল কামাল, তারপর আবার দৌড়। ট্রুপারদের বাঁ দিক দিয়ে কেটে পড়ার ইচ্ছে। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারল না, কয়েক গজ সামনে তীব্র আলোর ঝল্‌কানির সাথে বিস্ফোরণের বিকট শব্দে হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল ওরা। ধুলো গলায় ঢুকে যেতে কেশে উঠল সদরউদ্দিন।

রানা গুঙিয়ে উঠল কপাল চেপে ধরে। দরদর করে রক্ত ঝরছে কপাল থেকে, মাথা ঘুরছে। 'মর্টার ছুঁড়ছে ওরা!'

'তাই তো দেখছি,' শোয়া অবস্থাতেই ব্যস্ত হয়ে মর্টারে আরেকটা স্মোক শেল ভরল ক্যাপ্টেন। এক মুহূর্তও দেরি না করে ট্রিগার টানল। 'খুব লেগেছে, মাসুদ ভাই?'

'একটা স্প্লিন্টার বিঁধেছে কপালে,' সদরউদ্দিন বলল। টান মেরে তুলে এনেছে ওটা। 'মারাত্মক কিছু না।'

ওর বলা শেষ হতে না হতে পরপর আরও দুটো শেল বিস্ফোরিত হলো, এবার আগেরটার চাইতেও কাছে। ভীষণভাবে কেঁপে উঠল মাটি-ধুলোবালি, মাটির বড় বড় টুকরো ছিট্‌কে উঠল শূন্যে।

'উঠে পড়ো জলদি!' তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে বলল রানা। 'পরেরটা সোজা আমাদের ওপর ল্যান্ড করবে।'

হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে পড়ল সবাই, কিন্তু ওই পর্যন্তই, আচমকা হেভি মেশিনগানের গম্ভীর হুঙ্কারে ফের শুয়ে পড়তে বাধ্য হলো। ওদের নাকের ফুট দুয়েক সামনে দিয়ে ঠিক যেন ড্রপ্ খেয়ে ছুটে গেল একসার বুলেট।

মুহূর্তের জন্যে চোখ বুজল সদরউদ্দিন। জানত কোন না কোন সময়ে এভাবেই শেষ হবে জীবন, আজ বুঝি সে সময় হয়েছে। মেশিনগানের জন্যে সরে যেতে পারছে না ওরা, এদিকে ধোঁয়া সরে গেলে আর অল্পক্ষণের মধ্যে শত্রুর লাইন অভ ভিশন পরিষ্কার হয়ে যাবে। তারপর একটা কি দুটো মর্টার, ফুরিয়ে যাবে অধ্যায়।

'উঠে পড়ো!' রানার চিৎকারে চোখ মেলল সে। 'উঠে পড়ো! এরমধ্যেই পালাতে হবে।'

কিছু সময়ের জন্যে বিরতি দিয়েছিল শত্রুর মেশিনগান, আবার শুরু করল বুলেট বৃষ্টি। একটু পর থেমে গেল হুঙ্কার, আর ঠিক তখনই শুরু হলো ব্যাপারটা। আফগানদের অবস্থানের পিছন থেকে একযোগে গর্জে উঠল অসংখ্য ফায়ার আর্মস।

চোখ কুঁচকে উঠল রানার—কারা ওরা? ওদিকে তো আফগানরা ছিল না! নাকি ধোঁয়ার আড়াল নিয়ে সরে নতুন অবস্থান নিয়েছে! দূরে একটা ট্রাক দেখে জীবনের আশা ছেড়ে দিল ও। নিঃসন্দেহে আরও আফগান ট্রুপার এসেছে ওটায়। তার মানে…

সদরউদ্দিন গুঙিয়ে উঠল, 'ওহ্, খোদা! আজ আর রেহাই

নেই। হারামজাদারা দলে অনেক ভারী হয়ে গেছে।'

রানার সেদিকে খেয়াল নেই। হতভম্বের মত প্রথম আফগান লাইনের দিকে তাকিয়ে ওদের মেশিনগান থেমে যাওয়ার কারণ বোঝার চেষ্টা করছে। মর্টারও আর আসছে না, কেন?

'কি হলো?' প্রশ্নটা বের হলো কামালের মুখ থেকে। 'ওরা থেমে গেল কেন হঠাৎ করে?'

হাত দিয়ে সূর্য আড়াল করে কারণ বোঝার চেষ্টা করছিল রানা, আচমকা তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে বসল। 'আরে!' চেঁচিয়ে বলল, 'পিছনের ওরা আমাদের গুলি করছে না! ওরা আফগানদের...!'

ধড়মড় করে উঠে পড়ল অন্যরা। হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে থাকল। প্রথমে দ্বিধার হাসি ফুটল রানার মুখে, তারপর আস্থার এবং স্বস্তির। ভুল দেখেনি ও, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজনের দলটা সত্যিই তাই করছে। পিছন থেকে আচমকা হামলা করে প্রায় অর্ধেক আফগান ট্রুপারকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে এরইমধ্যে।

এ এক অবিশ্বাস্য সৌভাগ্য! চিন্তাই করা যায় না। অথচ...! তাক্ লাগা চোখে তাকিয়ে থাকল ওরা ভাষা হারিয়ে। মাথার ওপর স্মল ফায়ার আর্মস দোলাতে দোলাতে ছুটে আসছে লোকগুলো। কয়েক পা এগিয়ে থেমে পড়ছে, হতভম্ব ট্রুপারদের ওপর খানিক গুলিবৃষ্টি করে আবার এগোচ্ছে। দীর্ঘদেহী এক মোল্লা নেতৃত্ব দিচ্ছে ওদের। তার পাশে এক মেয়ে।

দেখতে দেখতে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল ট্রুপাররা। পালাবার চেষ্টা করল, কিন্তু সুবিধে করতে পারল না। দু'একজন নিতান্তই সৌভাগ্যবান ছাড়া অন্য সবাই মরল।

'ওরা বোধহয় মুজাহেদীন,' সদরউদ্দিন বলল।

মাথা দোলাল চিন্তিত রানা। 'হতে পারে।' কি ভেবে কামালের

দিকে হাত বাড়াল। 'তোমার গ্লাসটা দাও তো!'

ত্রিশ সেকেন্ড পর ভীষণ এক ঝাঁকি খেল ও। 'আরে!!! ওটা তো শহীদ, আমাদের সার্জেন্ট শহীদুল্লাহ্!'

'কি বললেন!' একযোগে বলে উঠল সদরউদ্দিন ও কামাল। চোয়াল ঝুলে পড়েছে দু'জনেরই। 'কে?'

'শহীদ!' রুদ্ধশ্বাসে বলল রানা। দেখায় যে ভুল হয়নি, তা ওদের নয়, নিজেকে বিশ্বাস করাতে চাইছে যেন। 'সার্জেন্ট শহীদ! হামিদা...হামিদা গুলিস্তানী!!'

'সে কি!' অনেক কষ্টে বলল করপোরাল।

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়েই আছে রানা। অবিশ্বাস্য, অলৌকিক মনে হচ্ছে ব্যাপারটা। ওরা দু'জন না হয় হলো, কিন্তু ওই লোকগুলো কারা? ওরা কেন নিজ দেশের সৈন্যদের ওপর হামলা চালাল?

বিপদের আশঙ্কা নেই দেখে বাঁদরের মত এক লাফে উঠে পড়ল সদরউদ্দিন, খিঁচে দৌড় লাগাল ওদের দিকে।

লরিতে চেপে ক্যানালের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল ওরা। দশমিনিটে জায়গামত পৌঁছে গেল। কৌতূহলী জনতার সামনে দিয়ে স্পীডবোটে উঠে পড়ল, দ্রুত বর্ডারের দিকে ছুটল। বিপদের আশঙ্কা পুরোপুরি কাটেনি, এখনও বেশ কয়েক মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে, কাজেই প্রত্যেকে সতর্ক।

যূথী-ডন ও শহীদ-হামিদাকে নিয়ে একটায় উঠেছে রানা। ক্যাপ্টেন কামাল ও সদরউদ্দিনও আছে সঙ্গে। ওদেরটা চলেছে আগে। পিছনেরটায় জাহাঙ্গীর, জাফর, আলাল ও হেকমত আলিসহ কামালের তিন সঙ্গী। প্রথমটা চালাচ্ছে সদরউদ্দিন, অন্যটা আলাল।

রানার সাথে চোখাচোখি হতে লাজুক হাসি দিল হামিদা গুলিস্তানী, শহীদের গা ঘেঁষে বসে ছিল, একটু সরে বসল। রানাও হাসল, পরক্ষণে চেহারা গম্ভীর করে সার্জেন্টের দিকে তাকাল। আড়ষ্ট হয়ে গেল লোকটা। 'পরে সব ব্যাখ্যা করব, বস্!'

মাথা ঝাঁকিয়ে সামনে মন দিল ও। সীটের পাঁশে নামিয়ে রেখেছে শেষ ফিন গ্রেনেডসহ লঞ্চার,-হাতে কারবাইন।

পাশ থেকে সার্জেন্টের পাঁজরে খোঁচা লাগাল সদরউদ্দিন। 'তোমার প্রাইভেট আর্মির ব্যাপারটা কি? কোত্থেকে জোটালে ওদের?' তার সংক্ষিপ্ত জবাব শুনে হেসে উঠল। 'বুঝলাম, কিন্তু আর্মির বিরুদ্ধে নামালে কি বলে?'

শ্রাগ করল শহীদ। 'সোজা। দূর থেকে কপ্টার দেখে সন্দেহ হলো তোমরা গ্যাঁড়াকলে ফেঁসেছ, তখনই ওদের সতর্ক করে দিলাম সামনে ইরানী ইনফিলট্রেটররা আছে, তৈরি হও তোমরা।'

'তারপর? আসার সময় ভাগালে কি বলে?'

হাসি ফুটল শহীদের ক্লান্ত মুখে। 'বলেছি আরও বড় এক শত্রু বাহিনীর সাথে লড়তে যাচ্ছি আমরা, তোমরা লুকিয়ে পড়ো। রাতে তোমাদের জন্যে প্রয়োজনীয় অস্ত্র নিয়ে আসছি আমি, তারপর...' হেসে উঠল শব্দ করে। 'উপায় ছিল না। রিইনফোর্সমেন্ট জানতে পেলে কচুকাটা করত ওদের, তাই ভাগিয়ে দিয়েছি যা-তা বলে।'

গলা খাদে নেমে গেল সদরউদ্দিনের। 'এ তোমার সঙ্গে কেন?' হামিদাকে ইঙ্গিত করল। 'কোত্থেকে জোটালে?'

মুখ খুলতে যাচ্ছিল সে আবার, কিন্তু সুযোগ হলো না। কামাল চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ, 'চপার! চপার আসছে!'

দশ

ভয়ঙ্কর অশুভ চেহারার এক অপচ্ছায়ার মত ওদের মাথার ওপর দিয়ে খুব দ্রুত উড়ে গেল ওটা। অনেক নিচু দিয়ে। সেই একই চিনূক!

বোটের এঞ্জিনের জন্যে ওটার আওয়াজ প্রথমে কেউ শুনতেই পায়নি। ব্যাপার ঠিকমত বুঝে উঠতে পারার আগেই ওদের গায়ে বাতাস লাগিয়ে চলে গেল চিনূক। কামালের হাঁক শুনে মুখ তুলতেই পাইলটের পাশের লোকটার সাথে চোখাচোখি হলো রানার। আগেরজন নয়, বুঝল ও, এ অন্য। পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মত বয়স, মুখটা ভারী। কে লোকটা?

'কর্নেল মুরাদ!' চেঁচিয়ে উঠল আতঙ্কিত সাংবাদিক। 'ওই সেই কর্নেল মুরাদ! এইবার আর রেহাই নেই!' কাঁদো কাঁদো অবস্থা হলো তার।

কেউ কথা বলল না, কাউকে কোন নির্দেশও দিতে হলো না রানার, থান্ডারবোল্ট আর স্যালভেজ মিশনের প্রত্যেকে যে যার অস্ত্র তুলে তৈরি হয়ে নিল। মরতে যদি হয়ই, কর্নেলকে সঙ্গে নিয়ে মরবে। রানা থাবা দিয়ে ওর রকেট লঞ্চার তুলে নিল। অনেকটা সামনে গিয়ে ঘুরল চিনূক, তবে সোজা হলো না, কাত হয়ে থাকল। পিছনে হ্যাঁচকা টান খেয়ে খুলে গেল স্লাইডিং দরজা.

হেভি মেশিনগানের ভীতিকর ব্যারেল দেখা দিল।

এখনই শুরু হবে, ভাবছে রানা। হলোও তাই, তবে মেশিনগান নয়, অন্যকিছু। চপারের ভেতরে এক রাশ সাদা ধোঁয়া দেখা দিল, পরমুহূর্তে চোখ ধাঁধানো ঝলকের সাথে কি যেন ছুটে এসে হুশ্‌শ্‌! করে আছড়ে পড়ল দুই বোটের মাঝখানে। গোল পিলারের আকার নিয়ে খাড়া হয়ে অনেক উঁচুতে উঠে গেল পানি, তারপর বৃষ্টির মত ঝরঝর করে আছড়ে পড়ল ওদের মাথায়। গোসল করিয়ে দিল সবাইকে।

'মর্টার ছুঁড়ছে শালারা!' দাঁতের ফাঁক দিয়ে বলল ক্যাপ্টেন।

মুহূর্তের বিরতি দিয়ে পরপর আরও দুটো শেল ছুটে এল। একটা বেরিয়ে গেল দু'নম্বর বোটের একদম পেট ঘেঁষে, অন্যটা ওদের বোটের ঠিক নাকের সামনে। ভার কম থাকলে নিঃসন্দেহে উল্টে যেত ওটা। তা হলো না বটে, তবে ভয়ঙ্করভাবে দুলে উঠল, হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল দুই মেয়ে যাত্রী। কম গেল না সাংবাদিকও।

'এঁকেবেঁকে চলো!' দোল সামলে চিৎকার করে নির্দেশ দিল রানা। ফুল স্পীড, ফুল স্পীড!'

কর্নেল চালাকি করছে, বুঝতে পেরেছে ও, দুই বোটের গতির সাথে তাল রেখে পিছিয়ে চলেছে কপ্টার। কিন্তু ফিন গ্রেনেডের আওতায় পেতে হলে ওটাকে আরও কাছে চাই রানার। নইলে বেঘোরে মরণ আছে কপালে।

'তোমার কাছে স্মোক বম্ব আছে, কামাল?'

'একটা আছে, মাসুদ ভাই। এক্সপ্লোসিভ বম্বও আছে একটা।'

'রেডি হও! হারি আপ্‌, ম্যান!'

হেভি মেশিনগানের কান ফাটানো হুঙ্কারে ওর শেষদিকের কথা চাপা পড়ে গেল। গান ফ্ল্যাশের তীব্র ঝলক কড়া রোদের

আলোতেও পরিষ্কার দেখল ওরা। ক্যানালের উঁচু পাড়ে বাড়ি খেয়ে বিকট প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল আওয়াজটা। তবে লাগল না, সামনের পানির বুকে মালার মত অর্ধেক গোল হয়ে ঘুরে গেল প্রথম বুলেট বৃষ্টির তোড়। হুলস্থুল পড়ে গেল দুই বোটে।

প্রথম দফা বলে লক্ষ্য স্থির করে নিতে পারেনি গানার, তবে এবার পারবে, ভাবছে রানা। হয় এখনই ওদের ঠেকাতে হবে, নইলে এবারই শেষ। এক হাঁটু গেড়ে বসে আছে ও, কোমরের কাছে ধরা গ্রেনেড লাঞ্চার, ওদিকে কামালও তৈরি। ফের গর্জে উঠল মেশিনগান। বো-র ওপর ঠক্ ঠক্ আওয়াজ উঠল, পরমুহূর্তে রানার ডান বাহুতে আগুনের ছ্যাঁকা লাগল যেন। অসহ্য যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল ও।

হাত থেকে লঞ্চার পড়ে যাচ্ছিল, অনেক কষ্টে ঠেকাল। গলার সব শক্তি দিয়ে চিৎকার করে বলল, 'ফায়ার নাউ!'

সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগার টিপে দিয়েছে ক্যাপ্টেন, শব্দ শুনতে পেল না ও, তবে কাজ দেখল। গুলির ফলাফল দেখতে গিয়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে নিজের কাজ ভুলে গিয়েছিল বোধহয় পাইলট, বোটের সাথে তাল রেখে পিছিয়ে যাওয়ার কথা মনে ছিল না। এদিকে ওরাও ফুল স্পীড দেয়ায় মাঝের ব্যবধান বেশ খানিকটা কমে এসেছিল। সোজা পিছনের খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল ফসফরাস বোমার শেল, পরক্ষণে ধোঁয়ায় সব অন্ধকার হয়ে গেল। মনে হলো যেন অদৃশ্য আগুন ছেঁকে ধরেছে চপারটাকে। মাতালের মত টলতে লাগল ওটা, কোনদিক যাবে বুঝে উঠতে পারছে না যেন।

ভেতরে কি চলছে দেখার সুযোগ হলো না রানার, পাঁচ সেকেন্ড পর শেষ ফিন গ্রেনেডটা ছুঁড়ল ও। একই সাথে কামালও ছুঁড়ল তার শেষ এক্সপ্লোসিভ বম্ব। দেখার মত হলো দৃশ্যটা।

সেকেন্ডেরও কম ব্যবধানে পর পর দুটো বেদম ঝাঁকি খেয়ে দুলে উঠল চিনূক, প্রকাণ্ড এক আগুনের গোলার মত বিস্ফোরিত হলো কান ফাটানো শব্দে। এক হাতে চোখ ঢাকল রানা আলো সহ্য করতে না পেরে, অন্য হাতে ধরা লঞ্চার ছেড়ে বসে পড়ল ধপ্ করে।

ধ্বংসস্তূপের হাত থেকে বাঁচার জন্যে যার যার বোটের নাক ঘুরিয়ে দিল দুই চালক। বেশ বড় জায়গা নিয়ে ঘুরে এসে আবার পাশাপাশি হলো। অনেক পিছনে, ক্যানালের দুই তীরে দাঁড়িয়ে থাকা হতভম্ব আফগানদের চোখের সামনে দিয়ে ছুটে চলল।

পিছনে ঝপ্ ঝপ্ করে পানিতে পড়ছে চিনূক এবং তার আরোহীদের ছিন্নভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। জ্বলছে সব দাউ দাউ করে।

ওর মধ্যে কোনটা কোনটা কর্নেল মুরাদের, বুঝতে পারল না মাসুদ রানা। গুলিবিদ্ধ ডান বাহু ধরে দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করার চেষ্টা করছে ও, চোখের সামনে দুলছে সবকিছু।

নিজেদের আর্মির টিউনিক দেখে আফগান গার্ডরা ওদের থামানোর কথা ভাবলও না পর্যন্ত। পাকিস্তানীরাও না। কারণ ওদের পোস্টের গার্ড-ইন-চার্জের সামনে বসা তখন হায়দার বালুচ। আফগানরা জানে ওগুলোয় তার 'মাল' আসছে পাচার হয়ে। জানে বটে, তবু বোট দুটোয় এত মানুষ দেখে মনে মনে চোখ কোঁচকাল ইন-চার্জ। ভাবল, ওরা কারা? 'মাল' কোথায় তাহলে?

অফিসারের জানার কথা নয়, হায়দার বালুচও মনে মনে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে সেদিকে। একই কথা ভাবছে সে-ও, কারা ওরা? কোন কুকর্ম ঘটিয়ে গেল আফগানিস্তানে?

বিএনএস আলমগীর।

আঁধার হয়ে আসছে দেখে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় প্রায় আধমরা

অবস্থা হয়েছে কমান্ডার রেজাউল হকের। দুপুরের মধ্যে ক্যাপ্টেন কামালের যোগাযোগ করার কথা ছিল, অথচ এখনও পর্যন্ত তার সাড়া নেই। রেডিও একদম ডেড। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না সে। দুপুরের পর থেকে সেই যে ফোরডেকে পায়চারি শুরু করেছে, এখনও চলছে তা।

অবশেষে আটটার দিকে থান্ডারবোল্টের আশা ছেড়ে দিল সে। সময় পেরিয়ে গেছে, আর দেরি করা যায় না। ঢাকাকে সতর্ক করতে হবে এখন তাকে। অপ্রিয় কাজ, কিন্তু কি করার আছে? দায়িত্ব তো পালন করতে হবে!

রেডিও রূমে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল কমান্ডার, এই সময় ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল সেকেন্ড অফিসার। 'স্যার! স্যার!! ওরা...'

বুকের মধ্যে ছাঁৎ করে উঠল তার। 'কি হয়েছে! ওরা কি?'

'কন্ট্যাক্ট করেছে। বলেছে, "ইনকামিং"।'

লোকটাকে ধাক্কা মেরে পথ থেকে সরিয়ে দিল কমান্ডার, ধুপ্‌ধাপ্ আওয়াজ তুলে দৌড় লাগাল রেডিও রূমের উদ্দেশে। মুখে বিজয়ের হাসি।

রাত বারোটার দিকে পানিতে নামানো হলো দুই অ্যাসল্ট ক্র্যাফট। গদার রওনা হয়ে গেল ওগুলো। থান্ডারবোল্ট আর স্যালভেজ মিশনকে নিয়ে যখন ফিরল, তখন প্রায় ভোর।

সবাইকে তুলে নিয়ে আন্তর্জাতিক পানিসীমার দিকে এগোল বিএনএস আলমগীর, তারপর মুখ ঘুরিয়ে পূর্ণগতিতে ছুটল বঙ্গোপসাগরের দিকে।

ভোরের আলোর আভাস সবে ফুটেছে তখন পুব আকাশে।

***

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

তুরুপের তাস

কাজী আনোয়ার হোসেন

মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো চায় সোনার চিতাবাঘটা কিছুতেই যাতে সন্ত্রাসবাদী নিওনাজী নেতা রুডলফ ব্রিগলের হাতে না পড়ে। রুডলফ ব্রিগল চায় হিদেতোশি নাকাতার চাবির টুকরোটা।

রাহাত খান চান রানা চিতাবাঘের মূর্তিটা উদ্ধার করুক।

ব্যারোনেস জুলিগ্রাফ চায় পিতৃহত্যার বিচার।

এবং

মাসুদ রানা চায় বন্ধু হত্যার প্রতিশোধ।

সুইটজারল্যান্ডের জেনেভায় পর্দা উঠল কাহিনীর।

দেখা যাক কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।